বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

গবেষক
পারভিন শাহনাজ আখতার
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

RB
B
677.39
AKB

এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ ইং

428201

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

গবেষকঃ
শামিয়া শাহ্‌নাজ আখতার
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

428201

তত্ত্বাবধায়কঃ
প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শামিয়া শাহ্‌নাজ আখতার- এর **"বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা"** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে। এ শিরোনামের উপর অভিসন্দর্ভ কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি। গবেষণার কাজ সন্তোষজনক।

(ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ ৩/৫/০৭
ঢাকা।

428201

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
428201

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একটি সমৃদ্ধশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে চাই সমৃদ্ধশালী কৃষির পাশপাশি উপযুক্ত শিল্পের বিকাশ। শিল্প বিকাশের দু'টি ধারা রয়েছে, একটি হল ভারী-বৃহৎ শিল্পের বিকাশ আর একটি হল ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। ভারী ও বৃহৎ শিল্প বিকাশে বাংলাদেশে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন- পুঁজির অভাব, খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা, শ্রমিক নিয়োগের কম সুযোগ, বিদেশী পুঁজির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের মতে কৃষি ভিত্তিক, মূলধন সাশ্রয়ী, শ্রমঘন এবং পরিবেশবান্ধব কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প বিকাশ আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ জাপান ভারী শিল্প বিকাশের পাশপাশি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশও লালন করে চলছে।

আমাদের রয়েছে নানা প্রকার কুটির শিল্পের স্বর্ণালী অতীত এবং হাজার বছরের অভিজ্ঞতা। অতীতে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল এবং কৃষি ও কুটির শিল্পের সমন্বয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল সমৃদ্ধশালী। বিভিন্ন কারণে আমাদের কুটির শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তপ্রায় কুটির শিল্পের একটি হল 'রেশম শিল্প'। অতীতে এই শিল্পের মধ্য দিয়ে হতো হাজার হাজার লোকের কর্ম সংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিত্তবানদের শহুরে জীবন যাপন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এখন এসব স্বপ্নের মত মনে হয়।

428201

আজকে সবার মনে রেশম শিল্প নিয়ে অনেক প্রশ্ন যেমন-এর অবনতির কারণ কি, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতিতে এর সম্ভাবনা কতখানি, সম্ভাবনাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, বিশ্বায়ন অর্থনীতির মহাসড়কে একে সামিল করা যাবে কিনা ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুমানের উপর ভিত্তি করে দেয়া ঠিক হবে না। এ জন্য চাই ব্যাপক গবেষণা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় রেশম শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে সরকারী বা ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। এ উপলব্ধি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রাজ্ঞ শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম স্যারের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এম.ফিল. প্রথম পর্বের ফলাফল ০৪-১১-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশ হওয়ার পর গবেষণার কাজ শুরু করি এবং অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তা শেষ করি, এ জন্য আমি আল্লাহ্তালার নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই গবেষণায় বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, এসব বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা পরিচালিত গবেষণা বাংলাদেশের রেশম শিল্প বিকাশে উৎসাহ প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করব বাংলাদেশ সরকার এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা অনেক আয়োজন নিয়ে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা কাজে এগিয়ে আসবেন। আমার এই গবেষণা যদি বাংলাদেশের রেশম শিল্প উন্নয়নে সামান্যতম সাহায্য করে তবে নিজকে ধন্য মনে করব।

আমার এই গবেষণা কাজে যাঁরা আমাকে প্রাথমিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও সদর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার তুঁতচাষী, পলুপালনকারী এবং তাঁতি; রাজশাহী শহরের সপুরাস্থ সিল্ক মিলের মালিকগণ এবং রাজশাহী শহরের সিল্কবস্ত্র ব্যবসায়ীবৃন্দ। আমি তাঁদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার এ গবেষণা কাজে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রকার তথ্য, বইপুস্তক দিয়ে সাহায্য করেছেন সে সবগুলো হলো-বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (BSB), রাজশাহী; বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (BSRTI), রাজশাহী; ভোলাহাট রেশম বীজাগার, ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ; মীরগঞ্জ রেশম বীজাগার, বাঘা, রাজশাহী; বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট (IBS), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS), ঢাকা; বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (BSF), ঢাকা এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আমি তাঁদের সবার নিকট কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উপর লেখা অনেক গবেষক, লেখক এবং লেখিকার বই-পুস্তক থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত আমার গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি। আমি তাঁদের নিকট ঋণী ও তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার এই গবেষণা কাজে যাঁরা সব সময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁরা হলেন- আমার আব্বা মোঃ শমশের আলী, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর; আম্মা দিলআরা আখতার বানু, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, নীলফামারী সরকারী কলেজ, নীলফামারী, আমার ভাই শিহাব আখতার ইভান এবং আমার স্বামী-ডাঃ হাবিবুর রহমান সরকার। এই গবেষণা কাজে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী এবং যিনি আমাকে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রাজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম স্যার; যাঁর ঋণ কোন দিন পরিশোধ করা যাবে না তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

তারিখ ঃ ০২.০৫.০৭
ঢাকা

শামিয়া শাহনাজ আখতার
এম.ফিল. গবেষক
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	i
সারণী তালিকা	v
শব্দ-সংক্ষেপ	viii
পরিভাষা	x

প্রথম অধ্যায়ঃ

* পরিচিতি

১.১ রেশমের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস	২
১.২ বাংলাদেশে রেশম শিল্পের ইতিহাস	৪
১.৩ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেশম পরিস্থিতি	১৪
১.৪ বাংলাদেশে রেশম শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৫
১.৫ গবেষণার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য	১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

তত্ত্বগত ধারণা এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা

তত্ত্বগত ধারণাঃ

২.১ অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা	২৪
২.২ উৎপাদন সম্পর্কিত ধারণা	২৮
২.৩ শিল্প সম্পর্কিত ধারণা	৩২
২.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা	৩৫
২.৫ রেশম শিল্প কোন ধরণের শিল্প	৩৬

রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা

২.৬ রেশম শিল্পে উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৭
২.৭ রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪৬
২.৮ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত রেশম কারখানাসমূহ	৪৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

* গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

৩.১ প্রাথমিক উৎস	৫৫
৩.২ মাধ্যমিক উৎস	৫৬
৩.৩ গবেষণা এলাকা	৫৬
৩.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫৯
৩.৫ প্রাসঙ্গিক বই পুস্তকের পর্যালেচনা	৬০
৩.৬ গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় বস্তু পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

* গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

৪.১ রেশম শিল্প সম্পর্কীয় কতিপয় প্রাথমিক ধারণা। ৬৮
৪.২ তুঁতচাষ সম্বন্ধীয় তথ্যের বিশ্লেষণ ৬৯
৪.৩ পলুপালন সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ। ৮১
৪.৪ রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ। ৯১
৪.৫ রেশম বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ। ৯৭
৪.৬ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ। ১০২

পঞ্চম অধ্যায়

অ-তুঁত রেশম
৫.১ এরি চাষ ১০৭
৫.২ তসর চাষ ১১৫
৫.৩ মুগা চাষ ১১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

সুপারিশমালা ও উপসংহার
৬.১ তুঁত চাষ সংক্রান্ত সুপারিশমালা ১২৩
৬.২ পলু পালন ও রেশম গুটি উৎপাদন সংক্রান্ত সুপারিশমালা ১২৫
৬.৩ রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত সুপারিশমালা ১২৭
৬.৪ রেশম কাপড় বুনন সংক্রান্ত সুপারিশমালা ১২৯
৬.৫ উৎপাদিত বস্ত্র বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা ১৩১
৬.৬ অন্যান্য সুপারিশমালা ১৩২
৬.৭ উপসংহার ১৩৬

পরিশিষ্ট-১ ঃ প্রশ্নমালা

প্রশ্নমালা ঃ ১ তুঁত চাষীদের মতামত i
প্রশ্নমালা ঃ ২ পলু পালনকারী বা বসনীদের মতামত iii
প্রশ্নমালা ঃ ৩ সূতা প্রস্তুতকারীদের মতামত v
প্রশ্নমালা ঃ ৪ বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের মতামত vii
প্রশ্নমালা ঃ ৫ খুচরা ব্যবসায়ীদের মতামত x

পরিশিষ্ট-২ ঃ সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের সারণী

১. তুঁতচাষীদের তথ্যের সারণী xii
২. পলু পালনকারীদের তথ্যের সারণী xvii
৩. সূতা উৎপাদনকারীদের তথ্যের সারণী xxii
৪. বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের তথ্যের সারণী xxv
৫. খুচরা ব্যবসায়ীদের তথ্যের সারণী xxx

পরিশিষ্ট -৩ ঃ আলোক চিত্র সমূহ XXXIV - XL

গ্রন্থপঞ্জী ঃ XLI - XLIII

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	বিভিন্ন সালে কাঁচা রেশম উৎপাদনের পরিমান	৭
১.২	বাংলাদেশে রেশমগুটি ও রেশম সূতা উৎপাদনের খতিয়ান	১২
১.৩	বিশ্বের প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশসমূহের তুঁত জমি ও কাঁচা রেশম উৎপাদনের খতিয়ান - ১৯৮৭	১৪
২.১	রেশম বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো	৪৩
২.২	রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানার আয় ও ব্যয়ের বিবরণী	৫২
২.৩	বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কর্মকান্ডের বাস্তব অগ্রগতি	৫৩
৩.১	তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এলাকা ভিত্তিক বন্টন	৫৯
৫.১	এরি রেশম কীটের জীবন চক্র	১১১

(প্রাথমিক তথ্যসমূহের সারণী)

১-তুঁত চাষীদের তথ্যের সারণী

১ (১)	তুঁত চাষীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	xii
১ (২)	তুঁত গাছ চাষ মূল পেশা কিনা	xii
১ (৩)	তুঁত চাষ কাদের দ্বারা করা হয়	xii
১ (৪)	জমির মালিকানার ধরণ কি	xiii
১ (৫)	তুঁত গাছের চাষ সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা	xiii
১ (৬)	মূলধন প্রাপ্তির উৎস	xiii
১ (৭)	তুঁত চাষ পদ্ধতির ধরণ	xiv
১ (৮)	কোন জাতের তুঁত চারা ব্যবহার করেন	xiv
১ (৯)	পানি সেচ ব্যবস্থা আছে কিনা	xiv
১ (১০)	জমিতে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করা হয় কিনা	xv
১ (১১)	তুঁত গাছের ক্ষতিকারক রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমনে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় কিনা	xv
১ (১২)	বিঘা প্রতি তুঁত পাতা উৎপাদনের পরিমান	xv
১ (১৩)	উৎপাদিত তুঁত পাতা কি ভাবে ব্যবহার করেন	xv
১ (১৪)	তুঁত পাতার চাহিদা বাড়ছে কিনা	xvi
১ (১৫)	তুঁত পাতার চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ	xvi

২-পলু পালনকারীদের তথ্যের সারণী

২ (১)	পলু পালনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	xvii
২ (২)	পলু পালন মূল পেশা না সহকারী পেশা	xvii
২ (৩)	পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পলু পালন কাজে সহযোগিতা করে কিনা	xvii
২ (৪)	মোট কতটি বন্দে পলু পালন করেন	xviii

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২ (৫)	কোন জাতের পলু পালন করেন	xviii
২ (৬)	আদর্শ পলু ঘর আছে কিনা	xviii
২ (৭)	তুঁত পাতা সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে কিনা	xix
২ (৮)	পলুপালনকারীদের প্রশিক্ষণ	xix
২ (৯)	পলু পালনের উন্নত মানের সরঞ্জামাদি আছে কিনা	xix
২ (১০)	পলুঘর ও সরঞ্জামাদি ফরমালিন ও ব্লিচিং দ্রবণে বিশোধন করাহয় কিনা	xix
২ (১১)	রোগাক্রান্ত হয়ে শতকরা কত পলুর মৃত্যু হয়	xx
২ (১২)	মূলধন প্রাপ্তির উৎস কি	xx
২ (১৩)	উৎপাদিত রেশম গুটি কিভাবে ব্যবহার করেন	xx
২ (১৪)	পলু পালনের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ	xxi
২ (১৫)	পলু পোকা পালনের উন্নতি সম্পর্কে পলু পালনকারীদের মতামত	xxi
৩-সূতা উৎপাদনকারীদের তথ্যের সারণী		
৩ (১)	সূতা উৎপাদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	xxii
৩ (২)	সূতা উৎপাদন করা কি ধরনের পেশা	xxii
৩ (৩)	সূতা উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ আছে কিনা	xxii
৩ (৪)	সূতা তৈরীতে ব্যবহৃত রেশম গুটির মান	xxii
৩ (৫)	সূতা রিলিং ও স্পিনিং পদ্ধতি	xxiii
৩ (৬)	মূলধনের উৎস	xxiii
৩ (৭)	উৎপাদিত সূতার ক্রেতা	xxiii
৩ (৮)	রেশম সূতার উৎপাদন হ্রাস জনিত কারণ সম্পর্কে মতামত	xxiv
৩ (৯)	সূতা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	xxiv
৪-বস্ত্র উৎপাদনকারীদের তথ্যের সারণী		
৪ (১)	প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরণ	xxv
৪ (২)	উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা	xxv
৪ (৩)	শ্রমিকেরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা	xxv
৪ (৪)	মূলধন সববরাহের উৎস	xxvi
৪ (৫)	বস্ত্র উৎপাদনে তাঁত ব্যবহারেব ধরণ	xxvi
৪ (৬)	রেশম বস্ত্র উৎপাদনে দেশী ও বিদেশী সূতার ব্যবহার	xxvi
৪ (৭)	রেশম বস্ত্র উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণ করেন কে	xxvii
৪ (৮)	রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কারখানার কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে কিনা	xxvii

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪ (৯)	ভোক্তাদের নিকট পণ্য বন্টন করেন কিভাবে	xxvii
৪ (১০)	বস্ত্রের ডিজাইনার আছে কিনা	xxvii
৪ (১১)	ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি	xxviii
৪ (১২)	মূল্য নির্ধারণ করেন কিভাবে	xxviii
৪ (১৩)	পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা আছে কিনা	xxviii
৪ (১৪)	ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের পদ্ধতি আছে কিনা	xxix
৪ (১৫)	ভোক্তার কোন বস্ত্রের প্রতি চাহিদা বেশী	xxix
৪ (১৬)	দেশী রেশম বস্ত্রের চাহিদা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরামর্শ	xxix
৫- খুচরা ব্যবসায়ীদের তথ্যের সারণী		
৫ (১)	বস্ত্র সংগ্রহের উৎস কি	xxx
৫ (২)	বর্তমানে সরবরাহকৃত বস্ত্রের ডিজাইনের মান উন্নত কিনা	xxx
৫ (৩)	উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের মান পূর্বের চেয়ে বর্তমানে কেমন	xxx
৫ (৪)	পূর্বের চেয়ে বর্তমানে পন্যের ক্রয়মূল্য কেমন	xxxi
৫ (৫)	সিল্ক বস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে কিনা	xxxi
৫ (৬)	রেশম বস্ত্রের বিক্রয় মূল্য বাড়ছে না কমছে	xxxi
৫ (৭)	বিদেশী কাপড় আমাদের দেশীয় বস্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে কিনা	xxxii
৫ (৮)	কি পদ্ধতিতে প্রসার কার্যক্রম চালানো হয়	xxxii
৫ (৯)	মূলধনের উৎস	xxxii
৫ (১০)	খুচরা ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশী সিল্ক কাপড়রের চাহিদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরামর্শ	xxxiii

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপ
(ABBREVIATIONS)

ADP	:	Annual Development Plan
BIBM	:	Bangladesh Institute of Bank Management.
BIDS	:	Bangladesh Institute of Development Studies
BKB	:	Bangladesh Krishi Bank
BMDC	:	Bangladesh Management Development Centre
BMET	:	Business Management Education and Training
BRAC	:	Bangladesh Rural Advancement Committee
BRDB	:	Bangladesh Rural Development Board
BSB	:	Bangladesh Sericulture Board
BSCIC	:	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSF	:	Bangladesh Silk Foundation.
BSRS	:	Bangladesh Shilpa Rin Sangstha
BSRTI	:	Bangladesh Sericulture Research and Training Institute
BMRE	:	Balancing Modernisation Reconstruction Extension
CARE	:	Co-operation of American Relief Everywhere.
DU	:	Dhaka University
DFL	:	Disease Free Layings
EPSIC	:	East Pakistan Small Industries Corporation
FAO	:	Food and Agriculture Organisation
GOB	:	Government of Bangladesh
IBA	:	Institute of Business Administration
IBS	:	Institute of Bangladesh Studies
IRDP	:	Integrated Rural Development Programme
Kg	:	Kilogram

Dhaka University Institutional Repository

MIDAS	:	Micro Industries Development Assistance Services
MOP	:	Ministry of Planning
NGO	:	Non- Government Organisation
RDRS	:	Rangpur Dinajpur Rural Services
RSF	:	Rajshahi Silk Factory
RU	:	Rajshahi University
SB	:	Shilpa Bank
SDC	:	Swisss Development Co-operation
SFCA	:	Swedish Free Church Aid
TMSS	:	Thangamara Mohila Sabuj Sangha
TSF	:	Thakurgaon Silk Factory
UGC	:	University Grant Commission
UNDP	:	United Nations Development Programme
VGD	:	Vulnerable Group Development
VGF	:	Vulnerable Group Feeding

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা
(Glossary)

অগ্রহায়নী	ঃ	বাংলা অগ্রহায়ন মাসে পলু পালনের সময়কে অগ্রহায়নী বলে।
আশ্বিনা	ঃ	বাংলা আশ্বিন মাসে পলু পালনের সময়কে আশ্বিনা বলে।
আষাঢ়ী	ঃ	বাংলা আষাঢ় মাসের পলু পালণের সময়কে আষাঢ়ী বলে।
উপজেলা	ঃ	একটি প্রশাসনিক ইউনিট। সাধারণত ২৫০ - ২৬০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এবং ২০০- ২৫০ হাজার জনসংখ্যা নিয়ে এ সমস্ত প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হয়েছে।
এক চক্রী	ঃ	দ্বিচক্রী রেশম কীটের মতই রেশম কীট। তবে বৎসরে মাত্র একবার ডিম প্রসব করে।
কাঁচা রেশম	ঃ	রিলিংকৃত রেশম সুতাকে কাঁচা রেশম বলে।
কাঠঘাই	ঃ	কাঠ দ্বারা নির্মিত হস্ত চালিত রিলিং যন্ত্রকে কাঠঘাই বলে। ইহা একটি দেশীয় পদ্ধতি।
কুয়া	ঃ	স্থানীয় ভাষায় গুটিকে কুয়া বলে।
কাহণ	ঃ	১২৮০টি গুটিকে কাহণ বলে।
খড়া	ঃ	বাঁশের তৈরী মাচান, যার উপরে ডালা রেখে পলু পালন করা হয়।
চাকী পলুপালন	ঃ	রোগমুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট পলুকে চাকী পলু বলে এবং এর পালনকে চাকী পালন বলে।
চৈতা	ঃ	বাংলা চৈত্র মাসের পলু পালনের সময়কে চৈতা বলে।
চন্দ্রকী	ঃ	বিশেষভাবে নির্মিত আসবাব যেখানে পাকা পলুকে গুটি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। ইহা সাধারণত বাঁশের তৈরী হয়ে থাকে।
চরকা	ঃ	দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মিত স্পিনিং চাকাকে চরকা বলে। ইহা সুতা তৈরীর সনাতন পদ্ধতি।
জৈষ্ঠা	ঃ	বাংলা জৈষ্ঠ্য মাসে পলু পালনের সময়কে জৈষ্ঠা বলে।
ডালা	ঃ	পলু বা রেশম কীট পালনের জন্য বাঁশের তৈরী ট্রে। এই ডালায় রেশম কীটের খাদ্য তুঁত পাতা সরবরাহ করা হয়।
ডেনিয়ার	ঃ	সিল্ক সুতার পুরুত্বের পরিমাপকে ডেনিয়ার বলে। ডেনিয়ার বিভিন্ন পরিমাপের হতে পারে। যেমন - ১৩/১৫, ২০/২২, ২৬/২৮, ৪১/৪৩ ইত্যাদি। বিশ্বে উৎপাদিত কাঁচা রেশমের অধিকাংশ ২০/২২ ডেনিয়ারের হয়ে থাকে।
থান	ঃ	প্রিন্ট ও কাজ বিহীন কাপড়। দৈর্ঘ্যে অনেক লম্বা হয় এবং প্রিন্ট করে ব্যবহার করা হয়।
দ্বিচক্রী	ঃ	যে সমস্ত রেশম কীট বৎসরে ২ বার প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে সে সমস্ত রেশম কীটকে দ্বিচক্রী বলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেএই ধরণের রেশম কীট দেখতে পাওয়া যায়। এদের ডিম ও উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত শীতল বা অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রস্ফুটিত হয় এবং জীবন চক্র শুরু হয়।
নিস্তারী	ঃ	দেশীয় রেশম কীটকে নিস্তারী বলে।
পণ	ঃ	রেশম গুটি গণনার ইউনিট। ৮০টি রেশম গুটিতে ১ পণ হয়।
পুপা	ঃ	পলু গুটি তৈরী শেষ করে গুটির মধ্যে অবস্থান নিয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পলুর এই অবস্থাকে পুপা বলে।

Dhaka University Institutional Repository

পলু	ঃ	রেশম কীটকে পলু বলে।
পলুঘর	ঃ	পলু পালনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ঘরকে পলুঘর বলে। ইহা নির্মাণের সময় পলু পালনের জন্য উপযুক্ত আলো বাতাসের দিকে নজর দিতে হয়।
ফিলেচার	ঃ	আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী বৃহদাকার সিল্ক রিলিং কারখানা।
ফড়িয়া	ঃ	এক ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। এরা উৎপাদনকারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পণ্য সংগ্রহ করে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে।
বন্দ	ঃ	গুটি উৎপাদনের ঋতুকে বন্দ বলে। যেমন - ভাদুরী বন্দ, আশ্বিনা বন্দ ইত্যাদি।
বিঘা	ঃ	জমি পরিমাপের ইউনিট। ৩৩.৩৩ ডেসিমেলে এক বিঘা হয়।
বৈশাখী	ঃ	বাংলা বৈশাখ মাসে পলু পালনের সময়কে বৈশাখী বলে।
বসনী	ঃ	রেশম কীট বা পলু পালনকারীদের বসনী বলে।
বেসিন	ঃ	সিল্ক রিলিং সরঞ্জামের অংশ বিশেষ। এখানে গরম পানিতে গুটি সমূহ ভাসমান থাকে।
বহু চক্রী	ঃ	গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের রেশম কীটকে বহুচক্রী বলে। এরা সারা বৎসর ধরে ডিম পাড়ে এবং সে সমস্ত ডিম সারা বৎসর ধরে ফুঁটে। এক কথায় বৎসরে বহু বার প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিধায় এদেরকে বহু চক্রী বলা হয়।
ভাদুরী	ঃ	বাংলা ভাদ্র মাসে পলু পালনের সময়কে ভাদুরী বলে।
মাঘী	ঃ	বাংলা মাঘ মাসে পলু পালনের সময়কে মাঘী বলে।
মঠকা	ঃ	কাঁটা ছেঁড়া, বিনষ্ট, রিলিং কাজের পর পরিত্যাক্ত এবং ফেঁসো ইত্যাদি গুটি হতে স্পিনিং পদ্ধতিতে যে মোটা রেশম সূতা তৈরী করা হয় তাকে মঠকা বলে। এগুলো সাধারণত পাঞ্জাবী, চাদর ও ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।
মণ	ঃ	ওজনের একক। ৩৭.৩২ কেজিতে ১ম মণ হয়।
মথ	ঃ	রেশম কীটের পুর্ণাঙ্গ রূপকে মথ বলে। মথ ৪-৫ দিনের মধ্যে মারা যায়।
মহাজন	ঃ	মহাজন এমন এক ব্যক্তি যিনি বস্ত্র উৎপাদনকারীদের কাঁচা মাল সরবরাহ করেন এবং মজুরীর বিনিময়ে উৎপাদিত পন্য ফেরত নিয়ে থাকেন।
লার্ভা	ঃ	রেশম কীটের জীবন চক্রের দ্বিতীয় স্তরকে লার্ভা বলে।
স্পান - সিল্ক	ঃ	বিনষ্ট গুটি হতে স্পিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে যে রেশম সুতা তৈরী করা হয় তাকে স্পান-সিল্ক বলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের মধ্যে রেশম হচ্ছে অন্যতম। এখন পর্যন্ত রেশমের সমতুল্য অন্য কোন তন্তু উদ্ভাবন অথবা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। রেশমের উজ্জ্বল্য, সূক্ষ্মতা ও কোমলতা অতুলনীয়। রেশম বস্ত্র সব ঋতুতে আরামদায়ক। রেশম বস্ত্র স্বর্গীয় পরিধেয়। পৃথিবীর ধনী দেশগুলো রেশমের বিকল্প আবিষ্কারের জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করে স্বীকার করেছে রেশমের সমতুল্য কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়।[১]

রেশম বলতে আমরা মূলত: বমবিক্স মোরি বর্গভূক্ত রেশম পোকার গুটি থেকে তৈরী এক প্রকার সুক্ষ্ম ও কোমল তন্তুকে বুঝিয়ে থাকি। এই তন্তু থেকে তৈরী বস্ত্রকেই রেশম বস্ত্র বলা হয়। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে তিন ধরনের রেশম বস্ত্র তৈরী হয়ে আসছে যথাঃ-মালবেরী, এন্ডি এবং তসর। প্রথমটি তৈরী হয় বমবিকসমোরি বর্গের রেশম পোকার গুটি থেকে যে পোকা মালাবেরী বা তুঁত গাছের পাতা খায়। দ্বিতীয়টি তৈরী হয় ফিলাসেমিয়া বর্গের অন্তর্ভূক্ত রেশমগুটি পোকা থেকে যারা ক্যাস্টোর গাছের পাতা খায় এবং তৃতীয়টি অ্যানথেরী তৈরী হয় অ্যানথেরী বর্গভূক্ত রেশম পোকার গুটি থেকে যারা ওক গাছের পাতা খায়। পৃথিবীর বস্ত্র জগতে রেশম বলতে আমরা মালবেরী বা তুঁত গাছের পাতা খেকো পোকা যে রেশম গুটি তৈরী করে তা থেকে প্রাপ্ত তন্তুকে বুঝে থাকি। কারণ পৃথিবীর সর্বমোট উৎপাদিত রেশমের ৯৫% এ জাতীয়। এ জাতীয় রেশমকে মালবেরী বা তুঁত রেশম ও বলা হয়।

১.১ রেশমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঃ

রেশমের উৎপত্তি বা আবিষ্কার সম্পর্কে নানাদেশে নানা মত রয়েছে। ইংরেজ ইতিহাসকারের মতকে সমর্থন করে কোন কোন রেশম তত্ত্ববিদ বলেছেন "চীন দেশই রেশম আবিষ্কারের ভূমি" উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপানী একটি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের উপর ভিত্তি করে মিঃ লীভ বলেছেন চীন দেশই রেশমের আবিষ্কার ভূমি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রথম স্থল। কেউ কেউ বাইবেলের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের একশত বৎসর পূর্বে চীনে রেশমের ব্যবসা শুরু হয়।[২]

---

১. তথ্য ও পরিসংখ্যান' ৯৪, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১

২. বাংলা পিডিয়াঃ ২০০৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠাঃ ১২৯-১৩১

Dhaka University Institutional Repository

"খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বিখ্যাত চীন সম্রাট 'হোয়াংটি' মতান্তরে 'ফোহিস্ব' নামক সম্রাটের চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা পত্নী, সীলিচী স্বয়ং রেশম কীট পালন করতেন। এই প্রসঙ্গে জনশ্রুতি মূলক একটি গল্প আছে যে সীলিচী তার রাজ প্রাসাদের কাছে একটি বাগানে পতঙ্গ বিশেষ একটি কীটের গুটি প্রস্তুত প্রণালী দেখে মুগ্ধ হন এবং উৎসুক হয়ে তিনি বাগান হতে সেই কীট ধরে এনে নিজ প্রাসাদে পালন করতে থাকেন এবং খাদ্য হিসাবে সেই বাগান থেকে পাতা সংগ্রহ করে খাওয়াতেন। কিছুদিন পর সেই কীট রাজ প্রাসদেও গুটি তৈরী করতে থাকে। এই গুটি থেকে সূতা তৈরী করে তিনি পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করেন। এরপর এ সূতা ও বস্ত্র বয়নের কথা ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।" পরে তা সমগ্র চীনে প্রসারিত হয়। এরপর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এই রেশম কোরিয়া ও জাপানে গিয়ে পৌছে। জাপানে এর দ্রুত উন্নতি হয় এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তার লাভ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে কোন সময় এবং কিভাবে রেমশ চাষ শুরু হয় তা নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। একটি মত এরকম কাশ্মীর দেশীয় নাগবংশীয় এক রাজপুত্রের সাথে চীন দেশের এক রাজকন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজ কন্যা স্বামীর বাড়ীতে আসার সময় তার খোপার মধ্যে লুকিয়ে রেশম পোকার কয়েকটি ডিম নিয়ে আসেন। সেই থেকে কাশ্মীরে এবং পরবর্তীতে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে রেশম চাষ বিস্তার লাভ করে। আর একটি মতে রেশম চাষ জাপান ও কোরিয়া থেকে প্রথম পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে পরে তা গোটা ভারত বর্ষে এবং ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।[৩]

অনেকে মনে করেন প্রাচীন মহাসিল্ক পথ (The Great Silk way) এর মধ্য দিয়ে ভারতসহ পৃথিবীর নানা স্থানে রেশমের চাষ বিস্তার লাভ করে। অনেকের মতে তিব্বতের মধ্য দিয়ে সিকিম, আসাম ও বাংলাদেশ পর্যন্ত আর একটি সিল্ক পথ ছিল। সেই পথ ধরে রেশম চাষ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে। আরও একটি মতবাদ হচ্ছে এ রকম ঐতিহাসিক প্রমান সাপেক্ষে সিন্ধু সভ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ভারত বর্ষই হচ্ছে রেশমের উৎপত্তি ও চাষের প্রথম স্থান।

---

৩. রাজশাহীর ইতিহাস, কাজী মোহাম্মদ মিছির,কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫, পৃ. ৩৪, ৩৫ ও ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. ২ বাংলাদেশে রেশম শিল্পের ইতিহাস ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও এর রেশম শিল্পের ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশ, অবিভক্ত বাংলা এবং পাকিস্তানের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে এবং কোন সময়ে রেশমের আবিষ্কার ও চাষ শুরু হয়েছিল তা নিয়ে অনেক মতবাদ থাকলেও ভারতীয় উপমহাদেশে আগত বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা, পুজা পার্বনে হিন্দুদের রেশম বস্ত্র পরিধান, রাজকর্মচারীদের বক্তব্য, পুরাতন অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা ইত্যাদি থেকে জানা যায় বহু প্রাচীন কাল হতে এদেশে রেশম বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা বহু পূর্ব হতে রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। In 1833 the then Principal of Rajshahi College wrote to the Director of Public Instruction of Bengal " Rampur Boalia has been the great emporium of silk for the last two thousand years"[৪]

বিদেশী পর্যটক ও ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অফিসারদের মতে বহু পূর্ব হতে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা অবিভক্ত বাংলা তথা গোটা উপমহাদেশে তুঁত চাষ, পলু পালন রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রান্টের মতে- "The Rajshai Jamindari produced with in the limites of its jurisdiction at least fourth-fifths of all the silks both raw or manufactured used in or exported from the Effiminited Luxurious Empire of Hindustan".[৫]

প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় রেশম শিল্প বিকাশে যে সমস্ত কারণ ও বিষয় কাজ করেছে তা হলো-তুঁত চাষ ও পলু পালনের উপযুক্ত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ; রেশম সূতা আহরণ ও বয়নের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর দক্ষ ও সস্তা শ্রমিক; স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বৃহৎ বাজার ইত্যাদি। প্রাচীন কালে অবিভক্ত বাংলা শুধু মাত্র রেশম শিল্পেই সমৃদ্ধ ছিল না, সূতীবস্ত্র শিল্পেও সমৃদ্ধ ছিল। পূর্ব বাংলার মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল ছিল সূতীবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিম ও উত্তর

---

৪. The Journal of the Institute of Bangladesh studies, Rejshahi University, Vol. XII, Annual 1989, Page. 12

৫. The District of Rajshahi Its Past and Present, Institute of Bangladesh Ntudies, Rajshahi, University 1983, Page. 261

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার গঙ্গা ও পদ্মা বিধৌত এলাকা ছিল রেশম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজশাহীর সিল্ক এবং ঢাকার মসলিন ছিল জগৎ বিখ্যাত। অবিভক্ত বাংলার বীরভুম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর. দিনাজপুর এবং আংশিকভাবে হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর রাজশাহী কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থানা বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত।

ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনের ফলে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অবিভক্ত বাংলার রেশম শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ সময়ে রেশম শিল্প প্রসার লাভের অনেকগুলি কারণ ছিল। মুঘল বাদশাহ্ আমীর ওমরাহ্ এবং বাংলার বিত্তশালী ব্যক্তিরা বাংলার সূতী ও রেশম বস্ত্র পছন্দ করতেন। তাঁরা বাংলার রেশম সূতা দ্বারা বস্ত্রের নকশার প্রবর্তন করেন। এ সময়ে আহমেদাবাদ (গুজরাট), মসলিপট্টম (মাদ্রাজ) লাক্ষ্ণৌ) ও কাশী (উত্তর প্রদেশ), মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী ও ঢাকা বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।[৬] এ সময়ে বাংলার নবাব, জমিদার, দেশীয় মহাজন ও রাজপুতগণ রেশম শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বাংলার রেশম ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা লাভজনক ছিল। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলার রেশম বস্ত্র ও কাঁচা রেশম বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর পরিমান বাংলার রেশমবস্ত্র ও সূতা ইংল্যান্ডের বাজারে সরবরাহ শুরু করে। এর ফলে ইংল্যান্ডের পশম ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীদের জীবন যাত্রার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাছাড়া বাংলার সিল্ক নগদমূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের ফলে ইংল্যান্ডের বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য বৃটিশ সরকার ১৭০০ খৃষ্টাব্দে চীন, পারস্য ও পূর্ব ভারত থেকে সকল প্রকার বস্ত্র আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাশ করেন।[৭] ফলে ভারতীয় রেশম বস্ত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

---

৬. রাজশাহীর ইতিহাস,কাজী মিছির, কাজী প্রকাশনা, বগুড়া- ১৯৬৫, পৃ. ৫৪

৭. The District of Rajshahi its past and Present, Institute of Bangladesh studies, Ru. 1983, Page - 265.

Dhaka University Institutional Repository

১৭০০ সালের আইন পাশের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ করলেও কোম্পানীর কাঁচা রেশমের ব্যবসায়ে কোন প্রকার ভাটা পড়েনি বরং তা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে কোম্পানীর নিকট রেশম সূতার ব্যবসায় লাভজনক হয়ে উঠে। রেশম সূতার ব্যবসায় এতটাই লাভজনক হয়ে উঠে যে পরিচালক মন্ডলী একটি চিঠিতে বাংলার কোম্পানী অফিসারদের বলেন "It is in the increase of this article (rawsilk) of our investment, that we chiefly depend for bringing home of our revenue "[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণগুলি হচ্ছে- ইউরোপের অন্যান্য দেশে পুনঃ রপ্তানির সুযোগ, চীন হতে আমদানী হ্রাস, ইংল্যান্ডের রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীদের নিকট বাংলার রেশমের জনপ্রিয়তা, বাংলার রেশম দ্বারা ফ্রান্স, ইটালীর রেশম ব্যবসায়ীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। এ সময়ে কোম্পানী কাঁচা রেশম ব্যবসায়ের লাভজনক অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতের রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। রেশম চাষ, পলুপালন ও সূতা উৎপাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ার নীতি অবলম্বণ করে। সূতা উৎপাদনকারীদেরকে কোম্পানীর নিকট সুতা বিক্রয়ে বাধ্য করা হয়। ফলে ভারতে তথা অবিভক্ত বাংলার তাঁতীদের রেশম বস্ত্র উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাঁচা রেশম ব্যবসায়ে জমজমাট ভাব লক্ষ্য করা যায় তবে বিভিন্ন কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এসে কোম্পানীর রেশম ব্যবসায়ের মন্দা ভাব শুরু হয়। অবশ্য উনিশ শতকের শুরুতে আবারও চাঙ্গা ভাব সৃষ্টি হয়। নেপলিয়ানের যুদ্ধ ও মহাদেশীয় ব্যবস্থার ফলে ইটালী হতে ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশম আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ইংল্যাণ্ডে বাংলার রেশম সূতার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সময় কোম্পানী তার কারখানাগুলিতে কাঁচা সিল্ক উৎপাদনের পরিমান দ্বিগুণ করে। তবে এই অবস্থা বেশী দিন টিকে থাকে না।

১৮১৩ সালের চার্টার আইন পাশ ও ১৮১৫ সালের নেপোলিয়ানের যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে রেশমের উৎপাদন আবার কমে যায়। কোম্পানী ভারতের শাসন ক্ষমতায়

---

৮. The District of Rajshahi Its Past and Present, Institute of Bangladesh studies, R.U. 1983, Page - 265.

Dhaka University Institutional Repository

অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার বাণিজ্যিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের আওতায় ১৯৩৫ সালে বাংলার সিল্ক ব্যবসা বন্ধ করে তার সমস্ত ফিলেচার ব্যক্তি মালিকদের নিকট বিক্রয় করে।[৯] এর ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তি মালিকানায় রেশম শিল্পের ধারা অব্যাহত থাকে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত অনেক চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে বাংলার রেশম শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলেও ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে প্রথমে রেশম বস্ত্র এবং পরে রেশম সুতা শিল্পের পতন শুরু হয়; উনিশ শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার রেশম শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। রেশম সমৃদ্ধ রাজশাহী জেলার একটি তথ্য বিবরণী হতে বাংলার রেশম শিল্পের পতনের ধারা সহজে অনুমান করা যায়।

সারণী - ১.১

বিভিন্ন সালে কাঁচা রেশম উৎপাদনের পরিমান

বৎসর	কাঁচা রেশমের উৎপাদন (মণে)
১৮৭০	৪৮৭৮
১৮৮১/৮২	১৩৪৩
১৮৮৩/৮৪	২০৭৭
১৮৮৪/৮৫	১৮১৮
১৮৮৭/৮৮	১২৪৪
১৮৮৮/৮৯	১১১২
১৮৮৯/৯০	১৩৮০
১৯৯০/৯১	১২০৪
১৯৯০/১১	৫২১

উপরোক্ত তথ্য বিবরণীতে দেখা যায় যেখানে ১৮৭০ সালে উৎপাদনের পরিমান ৪৮৭৮ মণ সেখানে ১৯১০ / ১১ সালে উৎপাদনের পরিমান মাত্র ৫২১ মন।[১০]

৯. The District of Rajshahi Its Past and Present, Institute of Bangladesh Studies, Ru. 1983, Page - 269.

১০. The Journal of the Institute of Bangladesh studies, Rajshahi University, Vol. XII, Annual 1989, Page.16

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত বাংলার রেশম শিল্পের পতনের কারণ সমূহ ঃ -

(১) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার বাণিজ্যিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা রেশম ব্যবসা থেকে নিজদের গুটিয়ে নেয়।'

(২) বাংলার নবাব ও মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠ পোষকতা বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তায় উন্নত মানের সূতী বস্ত্রের উৎপাদন শুরু হয় ফলে তাঁতে তৈরী রেশম বস্ত্র তার বাজার হারিয়ে ফেলে।

(৪) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, দেশীয় গোমস্তা, মহাজন ও কোম্পানীর কর্মচারীদের রেশম চাষীদের উপর অমানবিক অত্যাচারের কারণে অনেকেই রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের কাজ ছেড়ে দেয়।

(৫) ১৭৬৯-৭০ এর মহা দুর্ভিক্ষের কারণে অনেক রেশম চাষী ও কারিগর মৃত্যু বরণ করে। ফলে রেশম চাষ বাধা গ্রস্ত হয়।

(৬) ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খননের ফলে চীন ও জাপানের জন্য ইউরোপে রেশমজাত দ্রব্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়। ফলে বাংলার রেশমের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে।

(৭) উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ কারিগর দ্বারা পরিচালিত জাপান ও চীনের রেশম পন্যের মান উন্নত হওয়ায় বাংলার রেশম পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না।

(৮) পাটসহ অন্যান্য উৎপাদান লাভজনক হওয়ায় অনেকে রেশম চাষ ছেড়ে দেয়।

(৯) পেব্রিন নামক ছত্রাক পোকার আক্রমনে রেশম কীটের মহামারী দেখা দেয়। ফলে গুটির উৎপাদন কমে যায়।

পতনের যুগেও রাজশাহী অঞ্চলের রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ১৮৮২-১৮৯৮ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পদক্ষেপ গুলি হচ্ছে ১৮৮২ সালে রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে একটি বীজগার নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে কাশ্মীর ও দেরাদুন থেকে ডিম আমদানী করে রেশমকীট জন্মানোর চেষ্টা করা হয়; এক ফসলী ও বহু ফসলী রেশম কীটের জন্য তুঁত চাষের ব্যবস্থা করা হয়; ১৮৮৬ সালে বেঙ্গল গর্ভণমেন্টের অনুদানে ২টি নার্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৮৯৮ সালে একটি সেরিকালচার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়; এই স্কুলে ভারত সরকারের অনুদানে একটি বীজগার নির্মাণ করা হয়।[১১] কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ সব ব্যবস্থা ছিল নগণ্য।

---

১১. The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, R.U. Vol. XII Annual 1989, P. - 16,17

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং নাম দেয়া হয় পুর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে রেশম শিল্পের তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। এই উন্নতি না হওয়ার কারণ সমূহঃ- (১) পুর্ব বাংলায় রেশম কারখানা ছিল না এখানে শুধু রেশমগুটি উৎপাদন হত এবং সেগুলি পশ্চিম বঙ্গের কারখানার কাঁচা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত, (২) স্বাধীনতার পর অনেক হিন্দু রেশম চাষী ও রেশম কারিগর ভারতে চলে যায়, (৩) অবাধে বিদেশ থেকে রেশম সূতা আমদানী এবং (৪) সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রেশম শিল্প উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (EPSIC), ১০টি নার্সারী, ২২টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, রাজশাহীতে একটি সিল্ক রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টার এবং রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত করা হয়।১২

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ হলো ঃ- রেশম সুতার আমদানী নিষিদ্ধ করণ; পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ;সরকারী আধা সরকারী ও এন.জি.ও'দের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান; নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ।

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক রেশম শিল্পের জন্য যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয় তা হচ্ছে- রেশম শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম সংস্থান ও আয় বৃদ্ধি; সমুদ্র তীর বর্তী জেলাগুলি ছাড়া সব জেলায় রেশম চাষ শুরু, রেশম শিল্পের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বস্ত্র ও সূতার মান উন্নয়ন, বিদেশে বস্ত্র ও সূতা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, ব্যক্তিগত ভাবে রেশম শিল্প গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান, রেশম চাষী ও তাঁতীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ইত্যাদি।

রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী, আধা সরকারী এবং এন.জি.ও'দের মাধ্যমে সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়। এ লক্ষে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত। সমগ্র বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য এর রয়েছে ৪টি আঞ্চলিক অফিস; ৭টি জোনাল অফিস, বিভিন্ন

১২. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Pertomance, Constraints and Growth Potantials, Zaid Bakht and Others, BIDS 1988, Page. 5

Dhaka University Institutional Repository

জায়গায় সাব জোনাল অফিস, ১২টি নার্সারী; ৪২টি প্রদর্শন কেন্দ্র, ১৪০টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ২টি সিল্ক ফ্যাক্টরী ও একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট। এ ছাড়া ১০টি সরকারী, আধা সরকারী ও ১৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী (NGO) প্রতিষ্ঠান, ৪০০টি বিভিন্ন প্রকার সংগঠন ও প্রতিনিধি এবং ৫০টি রেশম সবনায় সমিতি রেশম শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা দেয়া শুরু করে।[১৩]

রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচী গুলির মধ্যে রয়েছে-ট্রেনিং প্রদান; উন্নতমানের ডিম ও তুঁত চারা বিতরণ; নার্সারী, কারখানা, ট্রেনিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন; ফিলেচার ক্রয়; এ ছাড়া ১০টি কাজের সমন্বয়ে গঠিত সমন্বিত স্কীম, রেশম চাষ সম্প্রসারণ, ক্রাশ প্রকল্প এবং বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড দ্বি-পক্ষীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

উপরোক্ত কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৩ /৭৪ - ১৯৮৯/৯০ সাল পর্যন্ত জাতীয় বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার পরিমান হল ঃ প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩/৭৪ - ১৯৭৭/৭৮) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বরাদ্দকৃত ৯০ মিলিয়ন টাকা থেকে রেশম শিল্পের জন্য নির্দ্ধারিত টাকা ১৯.৬৩ মিলিয়ন; দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮/৭৯ এবং ১৯৭৯/৮০) টা ৯৬ মিলিয়ন; দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০/৮১-১৯৮৪ /৮৫) টাকা ১৬০ মিলিয়ন (টাকা ২১ মিলিয়ন বিদেশী মুদ্রাসহ); তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫/৮৬ -১৯৮৯/৯০) টাকা ২৯০ মিলিয়ন।[১৪] এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সময়ে অনুদান হিসেবে টাকা প্রদান করে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা সত্বেও বাংলাদেশের রেশম শিল্প তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। নিম্নে বর্ণিত মোটামুটি তথ্য থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

১৯৭৭/৭৮ সালে গাছ ও বুশ উভয় পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করা হত। এরপর বুশ পদ্ধতির চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করে। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই কৃষকেরা বুশ পদ্ধতি

---

১৩. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS - 1988, Page - 6.

১৪. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakth and others, BIDS 1988, Page 149-154 d. 164 to 168

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দিয়ে গাছ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৭৭ হতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বুশ পদ্ধতিতে চাষের জমির পরিমান দাঁড়ায় ১৩৭১ হেক্টর তন্মধ্যে শুধুমাত্র ৫৯৯.৪০ হেক্টর টিকে থাকে। ১৯৮৪/৮৫ তুঁত চাষে নিয়োজিত জমির পরিমান ১৪৪৫.৮৫ হেক্টর যা দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা টার্গেট ২৯৮৬ হেক্টরের অনেক নীচে।

১৯৭৭/৭৮ সালে গুটি উৎপাদনের পরিমান ছিল ২২৭ মেট্রিক টন ১৯৭৮/৭৯ সালে তা বেড়ে গিয়ে ৪০১ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে গুটি উৎপাদনের পরিমান ৪৬৫ মেঃ টন যা নির্ধারিত টার্গেট ২৭৫০ মেঃ টনের অনেক নীচে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্র উপকুলবর্তী জেলাগুলি ছাড়া সব জেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণের টার্গেট থাকলেও একমাত্র বৃহত্তর রাজশাহী জেলার ভোলাহাটে দেশের ৬০% গুটি উৎপাদন হয়।

১৯৭৯ /৮০ সালে সুতা উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৫ হাজার কেজি। ১৯৮৩ / ৮৪ সালে এই পরিমান বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪ হাজার কেজিতে। ১৯৮৫ / ৮৬ সালে সুতা উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৯ হাজার কেজি যা টার্গেট ২৭২ হাজার কেজির অনেক নীচে।

১৯৮৫/৮৬ সালে সিল্ক বস্ত্র উৎপাদনের পরিমান ছিল ১.১৬ মিলিয়ন মিটার যা নির্ধারিত টার্গেট ২.৭৭ মিলিয়ন মিটারের অনেক নীচে।

বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতার হার আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচে। উচ্চ ফলনশীল তুঁত চারা গাছ ব্যবহার না করার ফলে আমাদের হেক্টর প্রতি বার্ষিক পাতা উৎপাদনের পরিমান ২০ মেঃ টন অথচ ভারতে তা ৩০ মেঃ টন। অনুরূপভাবে দেশীয় প্রজাতির সিল্ক কীট ব্যবহারের ফলে প্রতি ১০০ পাতার DFL থেকে উৎপাদিত গুটির পরিমান ২০ কেজি অথচ ভারতে তা ৩০ কেজি। বাংলাদেশে ১ কেজি রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১৩ থেকে ১৮ কেজি রেশম গুটির প্রয়োজন অথচ এই পরিমান জাপানে ৫ কেজি,কোরিয়ায় ৮ কেজি এবং ভারতে ১২ কেজি।১৫ লক্ষ্য মাত্রা পুরণ না হওয়ার কারণসমূহ নার্সারীগুলি থেকে উন্নত জাতের তুঁত চারা ও DFL সরবরাহ না করা; আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও দূর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সময় মত তহবিল না পাওয়া; ত্রুটি পূর্ণ বীজ সরবরাহের ফলে রেশম কীটের মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; দেশীয় কাঠঘাই পদ্ধতিতে সূতা আহরণ ইত্যাদি।

---

১৫. Sericulture Industry in Bangladesh: Analysis of Production Performance, Constrains, and growth Potentials : Zaid Bakht and others, BIDS 1988, Page - 6-8.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত রেশমগুটি ও রেশম সূতা উৎপাদনের একটি তথ্য বিবরণী দেয়া হল।

সারণী ঃ ১.২

বাংলাদেশে রেশমগুটি ও রেশম সূতা উৎপাদনের খতিয়ান ঃ

সাল	রেশমগুটি (মেঃ টন)	রেশম সূতা (মেঃ টন)
১৯৭৮-৭৯	২৩৩.০০	১৪.৫১০
১৯৭৯-৮০	৪০১.০০	২৪.৯৫০
১৯৮০-৮১	৪১১.০০	২৫.৭২০
১৯৮১-৮২	৪৩১.০০	২৬.৭৬০
১৯৮২-৮৩	৫৩৫.০০	৩২.৬৬০
১৯৮৩-৮৪	৫৩৮.০০	৩৩.৫৭০
১৯৮৪-৮৫	৩৯৩.০০	২৪.৪৯০
১৯৮৫-৮৬	৪৩৪.০০	২৭.০০০
১৯৮৬-৮৭	৪৯৬.০০	২৯.১৮০
১৯৮৭-৮৮	৪৭৭.০০	২৯.০০০
১৯৮৮-৮৯	৫৭৬.০০	৩২.০০০
১৯৮৯-৯০	৬৬৩.০০	৩৯.০০০
১৯৯০-৯১	৭৭২.০০	৪৫.৪১০
১৯৯১-৯২	৬৫০.০০	৩৮.৯০০
১৯৯২-৯৩	৭১৫.০০	৩৯.৫০০
১৯৯৩-৯৪	৭৩০.০০	৪০.২০০
১৯৯৪-৯৫	৭৫০.০০	৪০.৮০০
১৯৯৫-৯৬	৮০৯.০০	৪৬.২৩০
১৯৯৬-৯৭	৭৭০.০০	৪১.৬০০
১৯৯৭-৯৮	৫৫৮.০০	৩১.০০০
১৯৯৮-৯৯	৪৩৬.০০	২৫.৬৫০

বিঃ দ্রঃ তথ্য প্রাপ্তির উৎস বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য বিবরণী হতে বোঝা যায় রেশমগুটি ও সুতা উৎপাদনের পরিমান মাঝে মাঝে উঠা নামা করলেও মোটামুটি ভাবে স্থবির।

অতি সাম্প্রতিক কালের রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করা হল। বর্তমানে রেশম চাষ ও রেশম শিল্প অবনতির পথে। কতিপয় এন.জি.ও ছাড়া কোন প্রকার সংস্থা রেশম চাষে সহযোগিতা করছে না। রেশম বোর্ডের কর্মতৎপরতা শিথিল হয়ে পড়েছে। রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী কারখানাগুলিকে এবং তাঁতীদেরকে রক্ষা করার জন্য চীন থেকে রেশম সুতার নামে কৃত্রিম সিল্ক আমদানী করা হচ্ছে। ভারত থেকে চোরাই পথে রেশম সুতা আমদানী করা হচ্ছে। বস্ত্র বাজারগুলিতে কৃত্রিম সিল্ক বস্ত্রের আমদানী বেড়ে গেছে। নার্সারীগুলি প্রায় বন্ধের পথে। অনেকে রেশম চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রেশম বস্ত্র তাঁতীরা অন্য পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এই ফাউন্ডেশন সরাসরি কোন কাজ করে না। এন.জি.ও.'দের মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে। ভোলাহাট অঞ্চলের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও কতিপয় এনজিও রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এভাবে দেয়া যেতে পারে। প্রাচীনকাল হতে এই অঞ্চল রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত বিভিন্ন চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে রেশম শিল্প বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রথমে রেশম বস্ত্র শিল্প ও পরে রেশম সিল্ক শিল্পের অবনতি শুরু হয়। উনবিশ শতাব্দী ধরে তা চলতে থাকে যদিও মাঝে মাঝে চাঙ্গাভাব পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে রেশম শিল্প প্রায় বিলুপ্তি পথে চলে যায়। এই অবস্থা ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে রেশম চাষ ও রেশম শিল্প উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে নতুন করে রেশম শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯৯০ এর পরে এ অগ্রযাত্রা থেমে যায়। বর্তমানে রেশম শিল্প এক নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১. ৩ ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেশম পরিস্থিতি ঃ

বিশ্ব বাজারে রেশম আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বস্ত্র সামগ্রী। যুগ যুগ ধরে মানুষ রেশমকে ভালবেসে এসেছে। এখন পর্যন্ত রেশমের সমাদর বেড়েই চলেছে। আভিজাত্যের সাথে এর নিবিড়তা আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। তারপরেও সারা বিশ্বে উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রীর ০.২ শতাংশ ব্যবহৃত হয় রেশম। রেশমের চাহিদা প্রতিনিয়ত বেড়ে চললেও উৎপাদন সে তুলনায় বাড়ছে না।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৫৮ টি দেশে রেশম উৎপাদিত হয়। তার মধ্যে মাত্র আটটি দেশ যেমন চীন, ভারত, জাপান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ড উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮৭ সালে সারা বিশ্বে রেশম উৎপাদনের পরিমান ছিল ৬৩০০০ টন। তার মধ্যে চীন, ভারত ও জাপান একত্রে মোট উৎপাদনের ৮৪% ভাগ উৎপাদন করেছিল।

সারণী - ১.৩

বিশ্বের প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ সমূহের তুঁত জমি ও কাঁচা রেশম উৎপাদনের খতিয়ান (১৯৮৭ সাল) ।

দেশের নাম	তুঁত জমির পরিমান (হেক্টর)	উৎপাদিত কাঁচা রেশম (মেট্রিক টন)
চীন	৭,১৬,০০০ (আনুঃ)	৩৫৮০০
ভারত	২,৪১,৬০৩	৮৪৫৫
জাপান	৮,৮,৫০০	৭৮৬৪
রাশিয়া	৮০,০০০	৪০০০০
ব্রাজিল	৩৫,৬০০	১৭৮০
দক্ষিন কোরিয়া	১৯,৬০০	১৬০৮
থাইল্যান্ড	৩৬,৪২৯	৯৭৫
ভিয়েতনাম	৬,৪০০	১৭০
বাংলাদেশ	৩,২০০	৩২
অন্যান্য দেশ সমূহ	৩৪,০০০	১৬৯৬
মোট ঃ	১২,৬১৩৩২	৬২৩৮০

তথ্যঃ
1) Silk in India, Statistical Biennial 1988.
2) Souvenir, International Congress on Tropical Sericulture Practices, 1988.
3) Sericulture and Rural Development : Dutta and Ravi Kumar 1988.

Dhaka University Institutional Repository

রেশম বস্ত্রের প্রধান ভোক্তা দেশ হল আমেরিকা,পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, বৃটেন, জার্মানী, হংকং, দক্ষিন কোরিয়া, জাপান ও ভারত। শেষোক্ত তিনটি দেশ তাদের নিজস্ব উৎপাদন থেকে চাহিদার বিরাট অংশ পূরণ করে থাকে। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলি মূলত আমদানী নির্ভরশীল। সারা বিশ্বে একমাত্র চীনই প্রয়োজনীয় কাঁচা রেশম রপ্তানি করে থাকে। অন্যদিকে ভারত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তৈরী রেশম বস্ত্র রপ্তানি করে থাকে। উন্নত মানের রেশম বস্ত্র সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ভারত চীন থেকে উন্নতমানের কাঁচা রেশম আমদানী করে।[১৬]

১.৪ বাংলাদেশে রেশম শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

আমাদের দেশের শতকরা ৭৭ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। কৃষিই গ্রামের লোকের আয়ের প্রধান উৎস। এক সময়ে রেশম চাষ ও রেশম শিল্প গ্রামীন জনগণের আয়ের উৎস হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। দেশীয় প্রযুক্তির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সংমিশ্রন এবং সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেলে আজও রেশম চাষ ও রেশম শিল্প গ্রামীন তথা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের ভূমির গঠন, মাটির উর্বরতা, জলবায়ু এবং অন্যান্য ভৌগলিক পরিবেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে রেশম চাষের উপযোগী। এখানে অন্যান্য দেশের চেয়ে সহজে এবং সস্তায় তুঁত গাছের চাষ ও পলু পালনের মাধ্যমে রেশম শিল্পের কাঁচামাল রেশম গুটি উৎপাদন করা সম্ভব। এই কাঁচামাল দ্বারা রেশম শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

আমাদের দেশে রেশম শিল্প গৃহাশ্রায়ী (domisticated) শিল্প হিসেবে পরিচিত। এ শিল্পের অধিকাংশ কাজ বসতবাড়ীর মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। এ জন্য অতিরিক্ত কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে বসতবাড়ীকে রেশম শিল্পের উপযোগী করলেই যথেষ্ট। অথচ অন্যান্য শিল্পের জন্য আলাদাভাবে ঘরবাড়ী নির্মান করতে যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। রেশম শিল্প গৃহাশ্রয়ী হওয়ায় পরিবারের সকল সদস্য তাদের অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে স্বল্প পুঁজি ও সস্তা শ্রম দ্বারা উৎপাদিত রেশম পন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

---

১৬. বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প ঃ ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন কল-কারখানা। এই বাড়তি জনসংখ্যা এবং নতুন নতুন কল কারখানার জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করার ফলে জমির পরিমান কমে যাচ্ছে। এখন জমির সাশ্রয়ী ব্যবহার প্রয়োজন। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে রেশম শিল্প বিকাশ জাতির জন্য মঙ্গলজনক।একমাত্র রেশম কারখানা ছাড়া রেশম শিল্পের অন্যান্য কাজের জন্য বেশী জমির প্রয়োজন হয় না। নদী, নালা, বাঁধ ও রাস্তার ধার, পুকুর পার, জমির আল, পতিত জমি, বাড়ীর আশপাশ ইত্যাদি অব্যবহৃত জমিতে গাছ পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করে পলু পালন করা যেতে পারে। পলু পালনের জন্য তেমন একটা জায়াগার প্রয়োজন হয় না। এক কথায় রেশম শিল্প একটি জমি সাশ্রয়ী শিল্প।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ঘন জনবসতি পূর্ণ দেশ। এখানে প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী বেকার শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। এই সমস্যা সমাধানে এখানে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা শ্রমঘন (Labour Intensive) শিল্পের প্রয়োজন। একমাত্র শ্রমঘন শিল্পই পারে এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে। সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের রেশম শিল্প এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রেশম শিল্প হল একটি শ্রম ঘন শিল্প। কারণ তুঁতগাছ উৎপাদন, পলুপালন, সুতা তৈরী, বস্ত্রবয়ন, ডিজাইন ও রং করণ এবং বাজারজাত করণ ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন।

আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমান খুব কম। ফলে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের পরিমান খুবই কম। এজন্য আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্বেও বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের স্বল্প পুঁজির দ্বারা রেশম শিল্পের মত পুঁজি সাশ্রয়ী শিল্প গড়ে তুলতে পারি। এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাড়ী ঘর নির্মাণ, জমিজমা ক্রয় ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বেশী অর্থের প্রয়োজন পরে না। এক কথায় বিদেশী পুঁজি আগ্রাসন থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য রেশম শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে দেশের রেশম বস্ত্র কারখানা গুলিকে চালু রাখা রেশম বস্ত্র তাঁতীদের কর্মসংস্থান এবং দেশের রেশম বস্ত্র চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে রেশম সিল্ক ও সিল্ক বস্ত্র আমদানী করা হচ্ছে।

আধুনিক, উপযুক্ত ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশীয় রেশম সূতা বেশী করে উৎপাদন করতে পারলে বিদেশী রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্র আমদানীর পরিমান হ্রাস পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। একথায় বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে রেশম শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রেশম উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় রেশম উৎপাদনে আমাদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। আমাদের রয়েছে সস্তা শ্রম, উপযুক্ত ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। শুধুমাত্র উপযুক্ত ও আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেলে বাংলাদেশ রেশম শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে বিদেশেও রেশম জাত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। পরিবেশবিদদের মতে পরিবেশ বিনষ্টের প্রধান কারণগুলির মধ্যে বৃহৎ শিল্পকারখানা অন্যতম। এ সমস্ত বৃহৎ কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ও ধোঁয়া প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষনীয় করে তুলছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য চাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পগুলির মধ্যে রেশম শিল্প বিভিন্ন দিকে থেকে সম্ভবনাময়। সেজন্য রেশম শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা সহজ হবে। তাছাড়া রেশম শিল্পের প্রাথমিক কাজ তুঁত চাষ প্রকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

বৃহৎ শিল্প শুধুমাত্র পরিবেশই নষ্ট করে না বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে সামাজিক পরিবেশও নষ্ট হয়। বৃহৎ শিল্প স্থাপনের ফলে সৃষ্টি হয় শহর ও বস্তি। এ সমস্ত বস্তি নানা প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিনত হয়। এখান থেকে নানা ধরণের রোগ ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করলে সামাজিক পরিবেশ সহজে নষ্ট হয় না। আমাদের রেশম শিল্প বিকাশ লাভ করতে পারলে সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে।

শুধুমাত্র বৃহৎ শিল্প গড়ে তুললে কতিপয় লোকের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ জমা হবে। এর ফলে মথাপিছু আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমান সামাজিক অশান্তির জন্য অন্যান্য কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও একটি অন্যতম প্রধান কারণ। অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বেড়ে গেছে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, খুন এবং আইন শৃংখলার অবনতি। এ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য কমানো যেতে পারে। অন্য কথায় রেশম শিল্পের প্রসার মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য কমিয়ে সামাজিক পরিবেশ উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান খুব সামান্য। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কৃষিজ ফসল ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে বলে অর্থনীতিবিদগণ মতামত প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে পাট, চা ও চিনি শিল্প, কৃষি পন্যের উপর নির্ভর করে বৃহৎ শিল্প রূপে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প একটি কৃষি ভিত্তিক শিল্প। এ শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আকারে প্রসার লাভ করাতে পারলে দেশের আর্থিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখতে পারবে এবং পাট ও চায়ের ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে আনতে পারবে।

দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাড়তি শ্রমিকের কৃষি খাতে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বেকার শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বড় বড় শহরে ভিড় জমাচ্ছে। এর ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি গড়ে উঠছে বস্তি, বৃদ্ধি পাচ্ছে অসামাজিক কার্যকলাপ, সৃষ্টি হচ্ছে যানযট, দেখা দিচ্ছে পানি সংকট, ভেঙ্গে পড়ছে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইত্যাদি। এক কথায় নগর জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য গ্রামকে শহরমুখী নয় বরং শহরকে গ্রামমুখী করতে হবে। এ জন্য গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে কর্মসংস্থানের সহজ উপায় হল কৃষি ভিত্তিক, শ্রমঘন ও স্বল্প পুঁজি সম্পন্ন কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা। এ কাজে রেশম শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক কথায় শহরকে দুর্বিসহ অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য যদি গ্রামীন শিল্প বিকাশকে চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে রেশম শিল্প এক অনন্য ভূমিকা পালণ করবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সব সময়ই একই রকম থাকবে এমন আশা করা যায় না। তাই প্রতিটি দেশকে নিজস্ব সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সে দিকে দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের নিজস্ব সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে পরনির্ভরশীল রেশম শিল্পের পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীল রেশম শিল্প গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা

Dhaka University Institutional Repository

দরকার রেশম শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রেশম উৎপাদনকারী দেশের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

অতি সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে সিল্ক বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি লক্ষ্য করলে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের বিকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজে অনুমান করা যায়। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচিত হয়েছে। জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ বিলাস দ্রব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। বস্ত্র বিলাসের ক্ষেত্রে রেশম বস্ত্রের কোন বিকল্প নেই। তাই বস্ত্র ব্যবসায়ীরা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিভিন্ন প্রকার সিল্ক বস্ত্র আমদানী করছে। এমতাবস্থায় উপযুক্ত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের রেশম শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং দেশ রেশম বস্ত্রে আত্মনির্ভরশীল হবে।

কোন একটি শিল্পের গুরুত্ব বিচারে তার জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিবেচনা করা দরকার। যে শিল্পের জাতীয় ঐতিহ্য রয়েছে তার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোক্তা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি জ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভাব হয় না। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমাদের রয়েছে রেশম শিল্পের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা যা চীনের সাথে তুলনীয়। ইতিমধ্যে ঢাকাস্থ মিরপুরের কাতান পল্লী তা প্রমান করেছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়-বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক, গৃহাশ্রয়ী, পুঁজি সাশ্রয়ী, শ্রমঘন ও পরিবেশ বান্ধব রেশম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আয়ের সুষম বন্টন, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, নতুন কর্মসংস্থান, শ্রমিকের শহর মুখী প্রবণতা রোধ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.৫ গবেষনার গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্যঃ

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষনা হলেও অর্থনৈতিক ও শিল্প বিষয় নিয়ে তেমন গবেষনা করা হয় না। খোলা বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্ব অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে প্রতিটি শিল্প সম্পর্কে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। কোন শিল্পকে টিকে থাকতে হলে সব সময় এর সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুঁজে বেড় করতে হবে। আলোচিত শিল্প পণ্যটির কোন বিকল্প বাজারে আসছে কিনা তার খোঁজ-খবর রাখতে হবে। শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যটিতে নতুন কিছু সংযোজন এবং পুরাতন কিছু বিয়োজনের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে হবে।শিল্প পণ্যটির উৎপাদন ব্যয় ও বাজার মূল্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। শিল্পটিকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পটিকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার শক্তি অর্জন করতে হবে। এ সমস্ত কাজে যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

বাস্তবমুখী বিজ্ঞান সম্মত গবেষণাই পারে এ সমস্ত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাহায্যে কোন শিল্পের যে কোন সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা যায়।

শিল্প ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অন্তর থেকে কোন একটি শিল্পে সম্পর্কে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে উঠি। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রাজ্ঞ ও সম্মানিত শিক্ষক প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁর পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভবনা বিষয়টি বেছে নেই।

বাংলাদেশের অনেক রকম শিল্পের মধ্য থেকে রেশম শিল্পকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে কেন বেছে নিলাম। বাংলাদেশের রেশম শিল্পের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। একদা এই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু কাজ যেমন- তুঁত চাষ, পলু পালন, সূতা তৈরী এবং বস্ত্র বুনন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করত। রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করে প্রচুর টাকা পয়সা আমদানী হত। বাংলাদেশের রেশমজাত পন্য ছিল মুঘল বাদশাহ, আমীরওমরাহ্দের বিলাস দ্রব্যের অন্যতম একটি দ্রব্য। ইংরেজ আমলে এই রেশম জাত পন্য বিক্রয়ের টাকায় অনেকেই বিলাস বহুল শহুরে জীবন যাপন করত। ইউরোপীয় বণিকগণ বাংলার রেশমজাত পন্য বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। বর্তমানে বাংলাদশে রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্রের উৎপাদন কমে যাওয়ায় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে প্রাকৃতিক রেশম সিল্কের নাম করে কোটি কোটি টাকার কৃত্রিম সিল্ক সূতা ও সিল্ক বস্ত্র আমদানী করা হচ্ছে। কাঁচা রেশমের আমদানী কর তুলে দেয়ায় রেশম বস্ত্র উৎপাদন কারীরা বিদেশ থেকে কাঁচা রেশম আমদানী করছে। ফলে এ দেশের হাজার হাজার তুঁত চাষী, পলু পালনকারী, রেশম সূতা প্রস্তুত কারক এবং রেশম বস্ত্র তাঁতি বেকার হয়ে পড়ছে। গ্রামীন অর্থনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের স্বনির্ভর রেশম শিল্প হয়ে পড়েছে পরনির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রেশম সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমাগত ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের রেশম শিল্প এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থায় রেশম শিল্পের সমস্যাগুলি সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করে রেশম শিল্পের সত্যিকার সম্ভবনা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে অনেকগুলি রিপোর্ট ও প্রতিবেদন রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এইসমস্ত রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কম সংখ্যক কমিটি ও ব্যক্তি নির্ভরশীল ও দৃঢ় ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করতে পেরেছেন।

(ক) বাংলাদেশের রেশম শিল্পের অর্থনৈতিক,সামাজিক ও কারিগরী দিক।

(খ) রেশম শিল্পের সাথে জড়িত তুঁত চাষী, পলু পালনকারী, সূতা প্রস্তুতকারক, বস্ত্র উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত বাঁধার সম্মুখীন হন সে সমস্ত বাধার প্রকৃতি পরিমান ও ফলাফল।

(গ) উৎপাদন ব্যয় ও আয় সম্পর্কিত ধারণা।

(ঘ) বিভিন্ন স্তরে বাজারজাত করনের সমস্যা এবং বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতির সবল ও দুর্বল দিক ইত্যাদি।

বাংলাদেশের রেশম সিল্ক সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট ও প্রতিবেদন পাওয়া যায় সেগুলির প্রধান ত্রুটি হল অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক ও বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধান দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি। সামান্য সংখ্যক রিপোর্টের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয় তবে রিপোর্টগুলি পুর্ণাঙ্গ নয় এবং যথাযথভাবে বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করে বর্তমানে এই শিল্পের প্রকৃত সমস্যা ও সম্ভাবনার সঠিক মূল্যায়ন এবং বর্তমানে প্রাপ্ত রিপোর্ট সমূহের দুর্বলতা প্রভৃতি বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণা কাজটি করা হয়েছে। এই গবেষণা কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য সমূহ ঃ-

(১) বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে রেশম শিল্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরা।

(২) কৃষির সাথে রেশম শিল্পের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় রেশম শিল্পের কাজকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ তুঁত চাষ, পলু পালনের মধ্য দিয়ে গুটি উৎপাদন,

Dhaka University Institutional Repository

সূতা তৈরী, কাপড় বুনন ও বাজারজাতকরণ। এই গবেষনার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি স্তরের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সম্ভাবনাসমূহের প্রকৃত মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান।

(৩) রেশম শিল্পের প্রতিটি স্তরে আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন দ্বারা শিল্পটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোক পাতা করা।

(৪) শিল্পটি সত্যিকারভাবে লাভজনক কিনা সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

(৫) রেশম সিল্কের পাশাপাশি অ-তুঁত রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা।

(৬) রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারী,আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং এন.জি.ও.দের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ।

(৭) রেশম শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশী ও বিদেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের রেশম শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

(৮) রেশম শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ যেমন-তুঁত চাষ, পলু পালন ও গুটি উৎপাদন, সূতা রিলিং ও স্পিনিং, বস্ত্র উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় তত্ত্বগত ধারণা এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় তত্ত্বগত ধারণাঃ

বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা, উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ, শিল্পের শ্রেণী বিন্যাস, বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা এবং রেশম শিল্প কোন ধরনের শিল্প সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিম্নে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপরে আলোকপাত করা হল।

২.১ অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা ঃ

অভাবঃ মানুষের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজন মিটাতে পারে এরূপ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে অভাব বলে। যেমন- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। তবে কল্পনা প্রসূত যেমন-কেউ যদি আকাশে উড়ার জন্য পাখির ডানা কামনা করে এবং অবাস্তব যেমন একজন ভিক্ষুক ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় একটি সুন্দর বাড়ী ও কয়েকটি গাড়ী কামনা করে, এগুলিকে অর্থনীতিতে অভাব বলা যাবে না। অধ্যাপক হ্যানসনের মতে, "কেবল মাত্র ঐসব অভাবের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে যেগুলো পূরণের জন্য ক্রয় ক্ষমতা বিদ্যমান" (The only wants of economic importance are those backed up by the purchasing power necessary to satisfy them")[১]

ভোগঃ (Consumption): অর্থনীতিতে ভোগ বলতে কোন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বুঝায়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্যকে ভেঙ্গে, পুড়ে কিংবা পানিতে নিক্ষেপ করে এর উপযোগ নষ্ট করে তাকে ভোগ বলা যাবে না। যেমন একটি গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে এর উপযোগ নষ্ট করলে একে ভোগ বলা যাবে না। ব্যবহারের মাধ্যমে গাড়ীটির উপযোগ নিঃশেষ করলে তাকে ভোগ বলা যাবে। অতএব ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

সম্পদঃ (Wealth) সাধারণ অর্থে সম্পদ বলতে টাকা পয়সা ও ধন সম্পত্তিকে

---

১. উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতিঃ আবেদীন, বাকী আখতার, কাজী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা মে, ২০০২, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বুঝায়। অর্থনীতিতে শুধু অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলে। যে সমস্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের উপযোগ আছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান অপ্রতুল এবং যাদের হস্তান্তর যোগ্যতা ও বাহ্যিকতা রয়েছে সেগুলো অর্থনৈতিক দ্রব্য। আর এ অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলোই সম্পদ।

উপযোগিতাঃ (Utility) কোন বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের মধ্যে মানুষের বিভিন্ন মুখী চাহিদা বা অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে তাকেই সেই দ্রব্যের উপযোগিতা বলে। অধ্যাপক সেয়ার্সের মতে Utility is the quality or Capacity of a goods which enables it to satisfy human wants")[২] অর্থাৎ উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের বিশেষগুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পুরণ করতে পারে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করে যে বিভিন্ন পরিমান উপযোগ লাভ করে তার সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। প্রান্তিক বা অতিরিক্ত এক একক ভোগ করে ক্রেতা বা ভোক্তা যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

আয়ঃ (Income) প্রকৃত পক্ষে অর্থনীতিতে আয় বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ হতে যে উপযোগ বা তৃপ্তি প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। সম্পদকে বলা হয় উপযোগের তহবিল বা ভাণ্ডার এবং আয় হল সে ভাণ্ডার বা তহবিল থেকে নিঃসৃত উপযোগ বা তৃপ্তি প্রবাহ। প্রকৃত আয় এর আর্থিক মূল্যকে বলা হয় আর্থিক আয়। আয়কে মোট আয় ও নীট আয় হিসাবে ভাগ করা যায়। নির্দিষ্ট সময়ের যে আয় উপার্জন করা হয় তাকে মোট আয় বলে। উক্ত আয় উপার্জন করতে যে আনুষাঙ্গিক খরচ করতে হয় তা মোট আয় হতে বাদ দিলে নীট আয় পাওয়া যায়।

সঞ্চয়ঃ (Savings) আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের ভোগের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আধুনিক অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলতে আর্থিক প্রবাহ খাতে জমা করাকে বুঝায়, যেমন-ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা করা অথবা বন্ড, সঞ্চয় পত্র ইত্যাদি ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করাকে সঞ্চয় বলে।

---

২. উক্ত মাধ্যমিক অর্থনীতিঃ আবেদীন, বাকী আখতার, কাজী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা মে, ২০০২. পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চয়, আয় ও ভোগ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। আয় যদি ভোগ ব্যয়ের সমান হয় তাহলে কোন সঞ্চয় হবে না। আয় যদি ভোগ ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে সঞ্চয় হবে। $Y =$ আয়, $C =$ ভোগ ব্যয়, এবং $S=$ সঞ্চয় হলে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে সঞ্চয় দেখানো হয় -

$Y = C$ কোন সঞ্চয় (S) হবে না।

$S = Y - C$ ($Y > C$ হলে সঞ্চয় হবে।

মনে করি $Y =$ ১০০০ টাকা

$C =$ ৮০০ টাকা

সঞ্চয় $S = Y - C$

= ১০০০ টাকা - ৮০০ টাকা।

= ২০০ টাকা

ভোগ অপরিবর্তিত থেকে আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে। আবার আয় অপরিবর্তিত থেকে ভোগ কমলে সঞ্চয় বাড়বে। কিন্তু একই সময় যদি ভোগ বাড়ে এবং আয় কমে তা'হলে সঞ্চয় আরো কমবে।

বিনিয়োগঃ (Investment): সঞ্চয়ের যে অংশ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভে নজুদকৃত মুলধন দ্রব্যের সাথে সময় শেষে যে পরিমান অতিরিক্ত মুলধন দ্রব্যের সংযোগ ঘটে তাকে বিনিয়োগ বলে। মনে করি ২০০৩ সালের প্রারম্ভে বাংলাদেশের মোট মুলধনী দ্রব্যের প্রারম্ভিক মূল্য ছিল ৮০,০০০ কোটি টাকা এবং ২০০৩ সালের শেষে মোট সমাপনী মুলধনী দ্রব্যের মূল্য ১,০০,০০০ কোটি টাকা তাহলে ২০০৩ সালে বাংলাদেশে মোট বিনিয়োগের পরিমান হল ২০,০০০ কোটি টাকা। মুলধনী দ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ৪০০ কোটি টাকা হলে নীট বিনিয়োগের পরিমান হবে ১৬০০০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য করা যেতে পারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে অপর পক্ষে সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগ কমে।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য ঃ (Value) অর্থনীতিতে মূল্য শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথাঃ-

(ক) ব্যবহারিক মূল্য ও (খ) বিনিময় মূল্য।

(ক) ব্যবহারিক মূল্যঃ কোন দ্রব্যের অভাব মিটানোর ক্ষমতাকে ব্যবহারিক মূল্য বলা হয়। ব্যবহারিক মূল্য নির্ভর করে দ্রব্যের উপযোগিতার উপর। যেমন- পানি, বাতাস ও আগুণের ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম।

(খ) বিনিময় মূল্যঃ পক্ষান্তরে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অপর কোন দ্রব্য যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাকে বিনিময় মূল্য বলে। অর্থাৎ বিনিময় মূল্য বলতে কোন দ্রব্যের ক্রয় ক্ষমতাকে বুঝায় যেমন- ১ কেজি আমের বিনিময়ে ২ কেজি গম। দ্রব্যের দুস্প্রাপ্যতা, ব্যবহারকৃত মূল্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিনিময় মূল্য।

চাহিদা ঃ (Demand) সাধারণ অর্থে চাহিদা বলতে কোন কিছু পাওয়ার আকাংখা বা ইচ্ছাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে কোন দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলা হয়। যেমন একজন ব্যক্তির একটি রাজশাহী সিল্ক শাড়ী ক্রয়ের ইচ্ছা আছে। উক্ত শাড়ি ক্রয়ের আর্থিক সামর্থ্য আছে এবং আর্থিক সামর্থ্য ব্যয় করার ইচ্ছাও আছে। তাহলে ঐ ব্যক্তির শাড়ি ক্রয়ের ইচ্ছাকে অর্থনীতিক চাহিদা বলা হবে।

চাহিদা বিধি ঃ (Law of demand) দাম ও চাহিদার ক্রিয়াগত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে এটাই হল চাহিদা বিধি। অন্যান্য অবস্থা বলতে এখানে ক্রেতার রুচি, আয় পছন্দ ও সংখ্যার কথা বলা হয়েছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঃ চাহিদা বিধি অনুযায়ী দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। কিন্তু দামের পরিবর্তনের এবং চাহিদার পরিবর্তনের হার সব ক্ষেত্রে এক হয় না। সাধারণত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার সামান্য পরিবর্তন হয় এবং বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাই দামের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন " The degree of rapidity or slowness with which demand changes

Dhaka University Institutional Repository

with every change in price is known as elasticity of demand. (অর্থাৎ প্রতিটি দামের পরিবর্তনে চাহিদার যে দ্রুত বা মন্থর গতিতে পরিবর্তন হয় তার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

যোগানঃ (Supply) সাধারণতঃ আমরা যোগান বলতে কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমান বা মজুদকে বুঝি। অর্থনীতিতে যোগান বলতে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা মজুদের পরিমানকে বুঝায় না বরং কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে কোন ব্যবসায়ী যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক অর্থনীতিতে সেই পরিমাণকে যোগান বলে। ধরা যাক একজন সিল্ক বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট ১০০০ একক বস্ত্র রয়েছে। বর্তমানে বাজার দরে সে ৫০০ একক বিক্রয় করতে ইচ্ছুক। ঐ ৫০০ এককে সরবরাহ বলা হবে।

যোগান বিধি ঃ (Law of supply) দ্রব্যের দাম ও যোগানের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। এই বিধির মূলকথা হল অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না হলে দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যের দাম কমলে যোগান কমে যায়। যোগান ও দামের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমমুখী।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ঃ (Elasticity of Supply) দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কিন্তু উভয় পরিবর্তনের হার সবক্ষেত্রে সমান নয় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার সমান। কোন কোন ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের হার বেশী বা কম হতে পারে। দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে পরিবর্তন ঘটে তার মাত্রাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।৩

২.২ উৎপাদন সম্পর্কিত ধারণাঃ

উৎপাদনের সংজ্ঞাঃ সাধারণত কোন কিছু তৈরী করা বা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন সুতা থেকে কাপড় তৈরী, চামড়া দিয়ে জুতা তৈরী ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ পারে বস্তুর উপযোগিতা বাড়াতে। বস্তু হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত বিষয়। অর্থনীতিতে বস্তুর উপযোগিতা বৃদ্ধিকে উৎপাদন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

৩. উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতিঃ আবেদীন, বাকী, আখতার; কাজী প্রকাশনী, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা। মে, ২০০২, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুর উপযোগিতা বিভিন্ন উপায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বস্তুর আকৃতি বা প্রকৃতি, ব্যবহারের সময়, ব্যবহারের স্থান এবং মালিকানা পরিবর্তন করে বস্তুর উপযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে। এ কাজগুলিকে অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোনভাবে বস্তুর উপযোগিতা বাড়ানোকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে। এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে উপযোগিতা বৃদ্ধির কাজটির বাজারের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

মানুষের চাহিদা দুই প্রকার যথাঃ- বস্তুগত ও অবস্তুগত। বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কার্য দ্বারা যেমন ডাক্তারের পরামর্শ,উকিলের পরামর্শ,নার্সের সেবা,বিভিন্ন প্রকার চিত্ত বিনোদনমূলক কাজ দ্বারা মানুষের অবস্তুগত চাহিদা পূরণ করা যায়। সেজন্য এ সমস্ত কর্ম কাণ্ডকেও অর্থনীতিতে উৎপাদনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এক কথায় মানুষ ভোগের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষে করে আর উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ফ্রেসারের মতে " যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বুঝায় তাহলে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। কেয়ার্নক্রসের মতে "বিক্রির জন্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং মূল্যের বিনিময়ে যে সেবাকার্য প্রদান করা হয় তাকে উৎপাদন বলে।"[৪]

উৎপাদনের প্রকারভেদ ঃ উৎপাদনের অর্থ উপযোগ সৃষ্টি করা। উপযোগ বস্তুর আকৃতি, স্থান এবং সময় পরিবর্তন করে; সেবার মাধ্যমে এবং স্বত্ব পরিবর্তন করে সৃষ্টি করা যেতে পারে। অতএব উৎপাদন ৫ প্রকার যথা- রূপগত, স্থানগত, সময়গত, সেবামূলক এবং স্বত্বগত উপযোগিতা সৃষ্টি। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ-

(১) রূপগত উপযোগিতাঃ মানুষ তার মনন, মেধা, প্রযুক্তি, ব্যবহার করে বস্তুর রূপ বা আকৃতি পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে রূপগত উপযোগিতা বলে। যেমন- রেশম সুতা দ্বারা রেশম বস্ত্র, লোহা থেকে লৌহজাত দ্রব্য এবং কাঠ থেকে কাঠজাত দ্রব্য প্রস্তুত করাকে রূপগত উপযোগিতা বলে।

(২) স্থানগত উপযোগিতাঃ এক স্থান হতে দ্রব্য সামগ্রী অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করলে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে স্থানগত উপযোগ বলে। উদ্বৃত্ত স্থান হতে ঘাটতি স্থানে দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তরিত করে এ ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। রাজশাহী অঞ্চল হতে উদ্বৃত্ত সিল্ক বস্ত্র দেশের অন্যত্র বিক্রয় করে যে উপযোগিতা সৃষ্টি হয় তাকে স্থানগত উপযোগিতা বলে।

---

৪. উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি, আবেদীন, বাকী আখতার, কাজী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা, মে-২০০২, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

(৩) সময়গত উপযোগিতাঃ এক সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী অন্য সময়ে বিক্রয় বা ভোগ করে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে সময়গত উপযোগ বলে। যেমনঃ ধান কাটার মৌসুমে ধান গুদামজাত করে অন্য সময়ে বিক্রয় বা ভোগ করলে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে সময়গত উপযোগ বলে।

(৪) সেবাগত উপযোগিতাঃ সেবার মধ্য দিয়ে যে উপযোগিতা সৃষ্টি হয় তাকে সেবাগত উপযোগিতা বলে। ডাক্তারের পরামর্শ, উকিলের পরামর্শ, পার্কের বিনোদন ইত্যাদি।

(৫) স্বত্বগত উপযোগিতাঃ কোন মানুষের নিকট উদ্বৃত্ত সেবা বা দ্রব্য সামগ্রী থাকলে তা অন্যের চাহিদা পূরণে হস্তান্তর করতে পারে বা মালিকানা ত্যাগ করতে পারে এভাবে মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে বা তা গ্রহণ করে যে উপযোগিতা সৃষ্টি হয় তাকে স্বত্বগত উপযোগিতা বলে।

উৎপাদনের উপকরণঃ কোন দ্রব্য উৎপাদন বা সেবা দান করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের যেমন-বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল, তাপ, আলো, বাতাস, বিভিন্ন প্রকার-(খনিজ, জলজ ও কৃষিজ) কাঁচামাল, শ্রম, মনন, সেবা, সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদির প্রয়োজন এগুলিকে বলা হয় উৎপাদনের উপকরণ। এ সমস্ত উপকরণগুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ভূমিঃ উৎপাদনের মূল উপাদান হল ভূমি। ভূমি বলতে সাধারণতঃ পৃথিবীর উপরি ভাগের ব্যবহারযোগ্য অংশকে বুঝে থাকি। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ ছাড়াও পাহাড়, পর্বত, আলো-বাতাস, সমুদ্র, নদী, বনজঙ্গল, খনি ইত্যাদিকে ভূমি বলা হয়। এক কথায় প্রকৃতি প্রদত্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা জলজ, খনিজ, বনজ, যাবতীয় যেসব মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় সবগুলি ভূমির আওতাভূক্ত। উৎপাদনের এসব উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের আহার ও বাসস্থানের সামগ্রী সাধারণতঃ ভূমির উপর নির্ভরশীল। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল তখন ভূমিই উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বর্তমানে মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা কমে যাওয়ায় ভূমির গুরুত্ব কমে আসছে। তবুও উৎপাদনের একটি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ইহার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **শ্রমঃ** সাধারণত কোন উৎপাদনের জন্য মানুষ যে কায়িক শক্তি ব্যয় করে তাকে শ্রম বলে। তবে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে মানুষের কায়িক শ্রম ছাড়াও মানসিক চিন্তা ভাবনাও শ্রমের অন্তর্ভূক্ত। আনন্দের উদ্রেক করে এমন শ্রম বাদ দিয়ে মানুষের যাবতীয় কায়িক বা মানসিক শক্তি ব্যয়কে অর্থনীতিতে শ্রম বলে। উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। অবচেতন ভূমি থেকে উৎপাদন পেতে হলে সচেতন শ্রম একান্তভাবে প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে যন্ত্রপাতি শ্রমের স্থান দখল করে নিলেও প্রাণহীন যন্ত্রপাতি সচল রাখতে হলে শ্রম অবশ্যই লাগবে।

(গ) **মূলধনঃ** মূলধন বলতে আমরা সাধারণতঃ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত টাকা পয়সাকে বুঝি। টাকা পয়সা হলো ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন মূলধন সম্পদের আর্থিক মূল্যমাত্র। অর্থনীতিতে টাকা পয়সা নয় বরং উৎপাদন কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী, কাঁচামাল, বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলি যা উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে মূলধন বলে। মূলধন হল মানব নির্মিত ঐ সব সম্পদ যা বর্তমানে ভোগ না করে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে মূলধন বলা হয় না। বরং প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের উপর মানব শ্রম প্রয়োগ করে যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয় তা যদি উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে মূলধন বলে। আধুনিক অর্থনীতিতে মূলধন হল উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ইটালী, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হল মূলধন। বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে সে উদ্বৃত্ত দ্বারা মূলধন গঠন করতে হবে।

(ঘ) **সংগঠনঃ** উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রীকরণ, সুষ্ঠু বিন্যাস ও সমন্বয় সাধন, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সংগঠন হল মানব সম্পদ, কাঁচামাল, মূলধন, সম্পদ ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি কাঠামো বিশেষ যার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কার্য সম্পন্ন করা হয়। আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হল সংগঠন। একটি সুষ্ঠু সংগঠনই পারে কম মূলধন, স্বল্প কাঁচামাল ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে উৎপাদন সৃষ্টি করতে। উৎপাদনের অন্য তিনটি উপকরণ যথাঃ-ভূমি শ্রম ও মূলধন প্রাণহীন বা অবচেতন। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণহীন উপাদানগুলিকে সচল করার জন্য সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বৃহদাকার শিল্পের জন্য সংগঠনের বিকল্প কিছু নেই। সংগঠন ব্যবস্থার ফলে একই সঙ্গে হাজার হাজার কর্মী একই ছাদের নীচে কাজ করতে পারছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে ভূমি, দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রম, তৃতীয় পর্যায়ে মূলধন এবং চতুর্থ পর্যায়ে সংগঠন গুরুত্ব ভূমিকা পালন করছে। এক কথায় সভ্যতার অগ্রগতির সাথে উৎপাদনের উপকরণগুলির তারতম্য ঘটলেও প্রতিটি উপকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২.৩ শিল্প সম্পর্কিত ধারণাঃ

শিল্পের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে পণ্য সামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনকে শিল্প বলা হয়। তবে একথা ঠিক যে, মানুষ কোন জিনিস উৎপাদন করতে পারে না সে শুধু পারে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উপযোগ সৃষ্টি করতে। মানুষের এই উপযোগ সৃষ্টির কাজকে অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদন বলে আখ্যায়িত করেন। শিল্প মূলতঃ এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। একে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামগ্রীক রূপ বলা যায়। শিল্পের কাজ হল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, শোধন এবং রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পণ্য দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা। উদাহরণ স্বরূপ খনি থেকে লৌহ উত্তোলন, বনের কাঠ থেকে আসবাব পত্র তৈরী, তুলা থেকে কাপড় তৈরী, সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, ইমারত নির্মাণ ইত্যাদিকে শিল্প বলা হয়।

সুতরাং শিল্প বলতে সেসব কর্মপ্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়াকে বুঝায়; যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে এর রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য সামগ্রী বা সেবা কর্ম সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক এম.সি শুকলার (M.C. Shaukla) এর মতে "পণ্য দ্রব্যের উত্তোলন, উৎপাদন, রূপান্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ কিংবা সংযোজন প্রক্রিয়াকে শিল্প হিসাবে অভিহিত করা হয়।"

পি.এইচ. কলিন (P.H. Colin)- এর মতে "শিল্প হল সকল কারখানা প্রতিষ্ঠান অথবা প্রক্রিয়া যা পণ্য প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত।গুহ ও মুখার্জীর ভাষায় "যে কর্ম প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে এবং তার রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে মূল্য সৃষ্টি করে তাকে শিল্প বলে।"[৫]

---

৫. মোঃ আলতাফ হোসেন, ডঃ মোঃ আলাউদ্দিন, কারবার সংগঠন প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃ. ৪৩, ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শিল্প হলো উৎপাদনের যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করে এবং রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ভোগ ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার নিমিত্ত আরো অধিকতর উপযোগ সৃষ্টি করা।

শিল্পের প্রকারভেদঃ বর্তমান বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের যুগে আমরা বিভিন্ন ধরণের শিল্প দেখে থাকি। যে সব শিল্প পণ্য আমরা ভোগ করি তা বিভিন্ন ধরণের জটিল উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের হাতে এসে পৌছে। বিভিন্ন দিক বিচার করলে শিল্পকে সাধারণভাবে যে সকল ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখান হল।

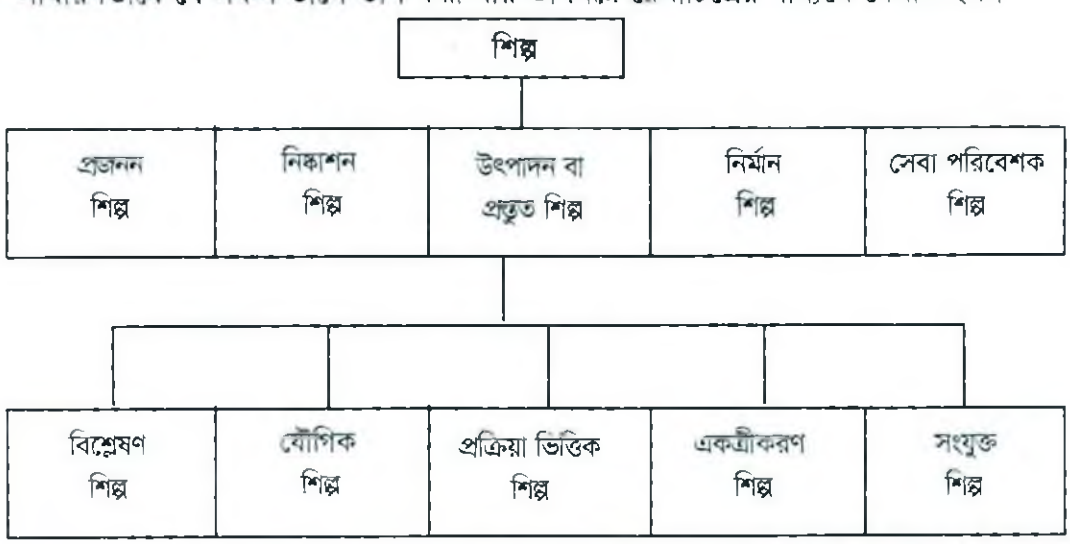

(১) প্রজনন শিল্প (Genetic Industry): যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টিকার্যে ব্যবহৃত হয় বা পরবর্তীতে ভোগের উপযুক্ত পণ্য সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন শিল্প বলে। নার্সারীতে সৃষ্ট চারা পরবর্তীতে গাছ বা ফলমূল উৎপাদন করে, পোলট্রি ফার্মে ডিম বা বাচ্চা উৎপাদিত হয়, হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদিত হয় যার সব কিছুই পরবর্তী উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের ভোগের উপযোগী পণ্য সৃষ্টি করে।

(২) নিষ্কাশন শিল্প (Extractive industry) যে শিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ বা সংগ্রহ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। ভুগর্ভ হতে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, সমুদ্র বা নদ-নদী হতে মাছ ও জলজ সম্পদ সংগ্রহ, বন হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি নিষ্কাশন শিল্পের আওতাভূক্ত।

(৩) উৎপাদন বা প্রস্তুত শিল্প (Production or manufacturing Industry) শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল বা অর্ধ প্রস্তুত জিনিসি কে মানুষের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াকে উৎপাদন বা প্রস্তুত শিল্প বলে। প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ শিল্পকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) বিশ্লেষণ শিল্পঃ (Analytical Industry) একই পদার্থ হতে বিশ্লেষনের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্যসামগ্রী তৈরীকে বিশ্লেষণ শিল্প বলে। যেমনঃ খনিজ তেল পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল কেরোসিন, ডিজেল, খনিজ কয়লা হতে কোক কয়লা, ন্যাপথালিন, আলকাতরা ইত্যাদি প্রস্তুত শিল্প।

(খ) যৌগিক শিল্প (Synthetic Industry) এই ধরণের শিল্পে পৃথক পৃথক পদার্থের সংমিশ্রণ করে নতুন দ্রব্য তৈরী করা হয়। লৌহ, আকরিক কয়লা, ম্যাঙগানিজ, চুনাপাথর ইত্যাদি পদার্থ মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয় তাই ইস্পাত শিল্প এরূপ শিল্পের উদাহরণ।সিমেন্ট, সার, সাবান ইত্যাদি শিল্প ও এরূপ শিল্পের আওতায় আসে।

(গ) প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প (Processing Industry) যে শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত হয় তাকে প্রক্রিয়া ভিত্তিক বা পর্যায়ভূক্ত শিল্প বলে। তুলা হতে বস্ত্র, পাট হতে থলে বা অন্য পাটজাত দ্রব্য তৈরীর শিল্প এর উদাহরণ।

(ঘ) সংযোজন শিল্প (Assembling Industry) অন্য শিল্পে উৎপাদিত উপকরণ বা অংশ বিশেষকে একত্রিত করে নতুন সামগ্রী উৎপাদনকে সংযোজন শিল্প বলে। মোটরগাড়ী, রেল ইঞ্জিন ইত্যাদি প্রস্তুত শিল্প এরূপ শিল্পের আওতায় আসে।

(ঙ) সংযুক্ত শিল্প (Integrated Industry) যে শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রক্রিয়ার একই সাথে সমন্বয় ঘটে তাকে সংযুক্ত শিল্প বলে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এর উদাহরণ।

(৫) নির্মান শিল্প (Constructive Industry) যে শিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, দালনকোঠা, ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।

(৫) সেবা পরিবেশক শিল্প (Service Industry) যে শিল্প মানুষের জীবন যাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি সরবরাহকৃত প্রতিষ্ঠান এরূপ শিল্পের আওতাভূক্ত।'[৬]

---

৬. উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ঃ মোঃ খালেকুজ্জামান, দি যমুনা পাবলিশার্স, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ১৫,১৬

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা ঃ

(ক) বৃহৎ শিল্পঃ বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ২৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। অন্য দিকে দেশের ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে যে সমস্ত শিল্পের মোট স্থায়ী বিনিয়োগ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী তাদেরকে বৃহদায়তন শিল্প বলা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন ও জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমানে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। পাট বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রভৃতি বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ।

মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যের যে পরিমান মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃহৎ শিল্প থেকে পাওয়া যায়। তবে বৃহৎ শিল্পে মূল্য সংযোজনের পরিমান সর্বাধিক হলেও এই উপখাতে কর্মসংস্থানের পরিমান তুলনামূলকভাবে কম। মাত্র ১৩% শিল্প শ্রমিক এখানে নিয়োজিত আছে।[৭]

(খ) ক্ষুদ্র শিল্পঃ বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমান অনুর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। পক্ষান্তরে ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী বিনিয়োগ অনুর্ধ্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়েছে। ছোট ছোট ফ্যাক্টরীতে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন কাজ চলে এবং সেখানে হাল্কা যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। হোসিয়ারী শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, দেয়াশলাই শিল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ।

বাংলাদেশের শিল্প খাতে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের শিল্প খাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প থেকে পাওয়া যায়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই উপখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ২৬ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

(গ) কুটির শিল্পঃ কুটির শিল্প সাধারনত মালিকের গৃহেই স্থাপিত হয় এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে-এর উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সরকারের ১৯৯১ সালের শিল্প নীতিতে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমান অনুর্ধ্ব ৫ লক্ষ

---

৭. বাংলাদেশের অর্থনীতি, আনিসুর রহমান, প্রকাশক প্রগতি পাবলিশার্স, ৩৮ বাংলা বাজার, অক্টোবর, ২০০১, পৃ. ৫৩১।

Dhaka University Institutional Repository

টাকা সেগুলোকে কুটির শিল্প বলা হয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প কাঠ শিল্প বিড়ি শিল্প, প্রভৃতি আমাদের কুটির শিল্পের উদাহরণ। মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কুটির শিল্পের অবদান সর্বনিম্ন। বাংলাদেশের শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমান মূল্য সংযোজিত হয় তাতে কুটির শিল্পের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৬১ শতাংশ কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।"

বাংলাদেশের শিল্পখাতে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সিংহভাগ কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদান সবচেয়ে কম। পক্ষান্তরে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে। অথচ বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমান সবচেয়ে কম, সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের শিল্প এক ধরণের দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী।

২.৫ রেশম শিল্প কোন ধরনের শিল্পঃ

রেশম শিল্প একটি কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্প। রেশম সুতার কাঁচামাল হলো রেশমগুটি। এই রেশমগুটি উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় যেমন তুঁত গাছের চাষ, পলু পালন, ইত্যাদি প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত। আবার রেশমগুটি থেকে সুতা প্রস্তুত এবং কাপড় প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াজাত শিল্পের অন্তর্গত। অতএব রেশম শিল্পকে একই সাথে প্রজনন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বলা হয়।

কাঠামোগত দিক থেকে বিচার করলে রেশম শিল্পের কতিপয় স্তর যেমন- তুঁত গাছ চাষের কাজ ও পলু পালন কৃষি ভিত্তিক কুটির শিল্প হিসাবে হয়ে থাকে। অপর পক্ষে সুতা প্রস্তুত এবং কাপড় বুননের কাজ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অতএব, কাঠামোগত বিবেচনায় রেশম শিল্প কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা ঃ

রেশম শিল্প সম্পর্কিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বা রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠানই কাজ করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্ত কাজ পাকিস্তানের শিল্প পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হত। ১৯৬১ সালে রেশম শিল্পকে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের আওতায় রেশম শিল্পের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেশম শিল্পের বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ৬২ নং অধ্যাদেশ বলে "বাংলাদেশ রেশম বোর্ড" প্রতিষ্ঠা করে। রেশম বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হয় ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ হতে। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিএসবি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৯০ সালে রেশম শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (বিএসএফ)।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এই শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ৬০টিরও বেশী এনজিও আমাদের দেশে রেশম চাষ উন্নয়নে কাজ করেছে এবং এখনও অনেক এনজিও কাজ করছে। এই সমস্ত এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আরডিআরএস, কেয়ার, এসএফসিএ, মাইডাস, কারিতাস, সেরিকালচার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সেভ দি চিলড্রেন, ঠেঁংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ, (টিএমএসএস), আইআরডিপি-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। নিম্নে রেশম শিল্পের উন্নয়নে জড়িত সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দেওয়া হল।

২.৬ রেশম শিল্পের উন্নয়নে জড়িত সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ-

(১) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) যা পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (ইপসিক) নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত রেশম চাষ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল কার্যক্রম বিসিক এর প্রশাসনের অধীনস্থ ছিল। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনটি প্রজেক্টের -এর কাজ তাদের মাধ্যমে চলতে থাকে, যথাঃ-(১) রেশম চাষের উন্নয়ন (নার্সারী এবং ডেমোনেস্ট্রেশন সেন্টার), (২) বাংলাদেশ রেশম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএস আর টি আই) এবং (৩) রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী (RSF) বিসিক ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রেশম সম্পর্কীয় সমস্ত কার্যক্রম চালাতে থাকে, তারপর এই সমস্ত কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলো তারা বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কাছে অর্পণ করে।

(২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), সাবেক পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সম্পত্তি এবং দায় নিয়ে ১৯৭২ সালে অস্তিত্ব লাভ করে। বিকেবি, সাধারণত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদেরকে অর্থ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এটি কুটির শিল্প ভিত্তিক শিল্পগুলোকে স্থাপিত করার জন্য এবং এগুলোর উন্নয়নের জন্য অগ্রিম ঋণ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বিকেবি তুঁত চাষ ও পলু পালনের তৃণমূল পর্যায় থেকে তুঁত চাষী এবং পলু পালনকারীদের মধ্যে ঋণ এবং ভুর্তকী প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের Credit Cum-Subsidy Scheme এর আওতায় তারা এ ভর্তুকী ও ঋণ প্রদান করে থাকে। সুইস - বাংলাদেশ যৌথ প্রকল্প গঠনে বিকেবি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ সাহায্য দিয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS) ঃ

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর অধীনে Pakistan Industrial Credit and Investment corporation, Invesment Corporation of Pakistan and National Investment Trust একত্রিত করে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) এর উদ্ভব হয়। রাজশাহীর উত্তরা সিল্ক মিল্স বিএসআরএস-এর সহায়তায় গড়ে উঠে এবং আরও কিছু প্রাইভেট সিল্ক মিলের প্রজেক্ট বিএসআরএস-এর আওতায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেশম চাষের একটি ছোট-খাট প্রকল্প রয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত। এটি একটি গবেষণা প্রকল্প যার লক্ষ্য হল গবেষণামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা। যতদূর জানা যায় খুব বেশী গবেষণা কাজ সেখানে সম্পাদিত হয়নি।

(৫) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ঃ (BSB)

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ১৯৭১ বলে Industrial Development Bank এবং Equity Participation Fund এর সম্পত্তি এবং দায় নিয়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক অস্তিত্ব লাভ করে। SB বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের অর্থ সংস্থানজণিত কোন প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত নয়। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের কিছু রেশম কারখানা যেমন রাজশাহী শাহ্ মখদুম সিল্ক ফ্যাক্টরী, ঠাকুর গাঁও-এর নূর সিল্ক মিলস্ এসবির আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠে। এছাড়াও শিল্প ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টরে কিছু ব্যক্তিকে যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী তাদের জন্য রেশম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু রেশম গুটি সরবরাহের অনিশ্চয়তা প্রবনতার জন্য তা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়নি।

(৬) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ঃ

দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সুইস ডেভলপমেন্ট কোঅপারেশনের (SDC) এর সহযোগিতায় Food, Fiber, and Fuel Research" (Eri Project) এর উপর একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করে এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে অনুমোদন চায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনাটি রেশম বোর্ডের নিকট পাঠিয়ে দেয় প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য।

পরবর্তীতে প্রকল্পটি কোথায় হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে না রেশম বোর্ডের ভেতরে এ নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব চলে। অবশেষে প্রকল্পটি কার্যকরী করার জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়।[৮]

---

৮. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS, 1988, Page - 155 - 157

Dhaka University Institutional Repository

(৭) বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (BSB)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেশম শিল্পের বিভিন্ন গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এবং গ্রামীন জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির ৬২ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের গঠনঃ রাষ্ট্রপতির ৬২ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ ঃ

(ক) সার্বক্ষণিক সদস্যঃ

১. একজন চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত

২. তিনজন সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত

(খ) খন্ডকালীন সদস্যঃ

৩. মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (এক্স - অফিসিও)

৪. পরিচালক বস্ত্র দপ্তর (এক্স - অফিসিও)

৫. রেশম পোকা পালনকারী (রিয়ারার), রেশম কাটাই (রিলার), রেশম কাপড় বুননকারী (উইভার) এবং রেশম ব্যবসায়ীদের (ডিলার) মধ্যে হতে একজন করে সরকার কর্তৃক মনোনীত মোট ৪ জন প্রতিনিধি

৬. অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে একজন প্রতিনিধি।

বোর্ডের দায়িত্ব ঃ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ-

১. রেশম শিল্পের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২. রেশম শিল্পের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষন প্রদান।

৩. উন্নত জাতের তুঁত চাষ প্রবর্তন।

৪. রোগমুক্ত উন্নত ও সুষ্ঠু ডিম / কীট উদ্ভাবন।

৫. সরকারী ও বেসরকারীভাবে উন্নতমানের রেশম সূতা আহরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

৬. রেশম শিল্পের সকল পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ করা।

৭. রেশম চাষীদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

৮. রেশম শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রেণীর পেশাজীবিদের ন্যায্যমূল্যে আমদানীকৃত উপকরণ সরবরাহ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

১০. উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ দেশ বিভাগের সময় রেশম চাষ শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে দেশের অন্যান্য অংশে শুরু করা হয়। ১৯৭৭ সালে রেশম খ্যাত রাজশাহীতে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সালে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এর কাজ শুরু করে। রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর উত্তরে ঠাকুরগাঁও জেলা হতে দক্ষিণ সাতক্ষীরা এবং পূর্বে বান্দরবন জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশের ৩৬টি জেলার ১৯০টি থানায় রেশম চাষ বিস্তৃত। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকীর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নিম্নলিখিত অফিস সমূহের মাধ্যমে সংযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রধান কার্যালয় ঃ রাজশাহী

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	ঃ	১টি (রাজশাহী)
আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র	ঃ	চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি জেলা।
রেশম কারখানা	ঃ	২টি, রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও।
সম্প্রসারণ রিজিয়ন	ঃ	৫টি রাজশাহী, ঢাকা, রংপুর, যশোর ও রাংগামাটি।
বিশেষ রেশম সম্প্রসারণ প্রকল্প	ঃ	রাংগামাটি, পার্বত্য জেলা।
সম্প্রসারণ জোন	ঃ	১১টি, রাজশাহী, ভোলাহাট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, যশোহর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাংগামাটি।
রেশম বীজাগার	ঃ	৯টি, ভোলাহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ, মীরগঞ্জ, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, কোনাবাড়ী ও ময়নামতি।
রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	ঃ	৪২টি, দেশের বিভিন্ন স্থানে।
রেশম সম্প্রসারণ উপকেন্দ্র	ঃ	১৬৪ টি, দেশের বিভিন্ন স্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

মিনিফিলেচার	ঃ	৯টি, ভোলহাট, মীরগঞ্জ, দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, রানীসংকৈল, কোনাবাড়ী ও মায়া।
ক্ষুদ্র তুঁত বাগান	ঃ	৮টি, রত্নাই, সনকা, সাকোয়া, ঠান্ডিয়াম, সাদামহল, ব্রাহ্মণ ভিটা, দারোয়ানি, রেইচ্যা।
গ্রেনেজ	ঃ	২টি, ভোলাহাট, ময়মনসিংহ।
বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র	ঃ	৪টি (রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও ঠাকুরগাঁও)
এম.আই. এস. সেল	ঃ	১টি (রাজশাহী)

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ রেশম বোর্ডের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত চেয়ারম্যান প্রশাসনিক প্রধান এবং তিনি সকল প্রকার প্রশাসনিক, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাকে বোর্ডের নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকল প্রকার সহযোগিতা করেন। নিম্নে সাংগঠনিক কাঠামো দেখান হল -

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ২.১

রেশম বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

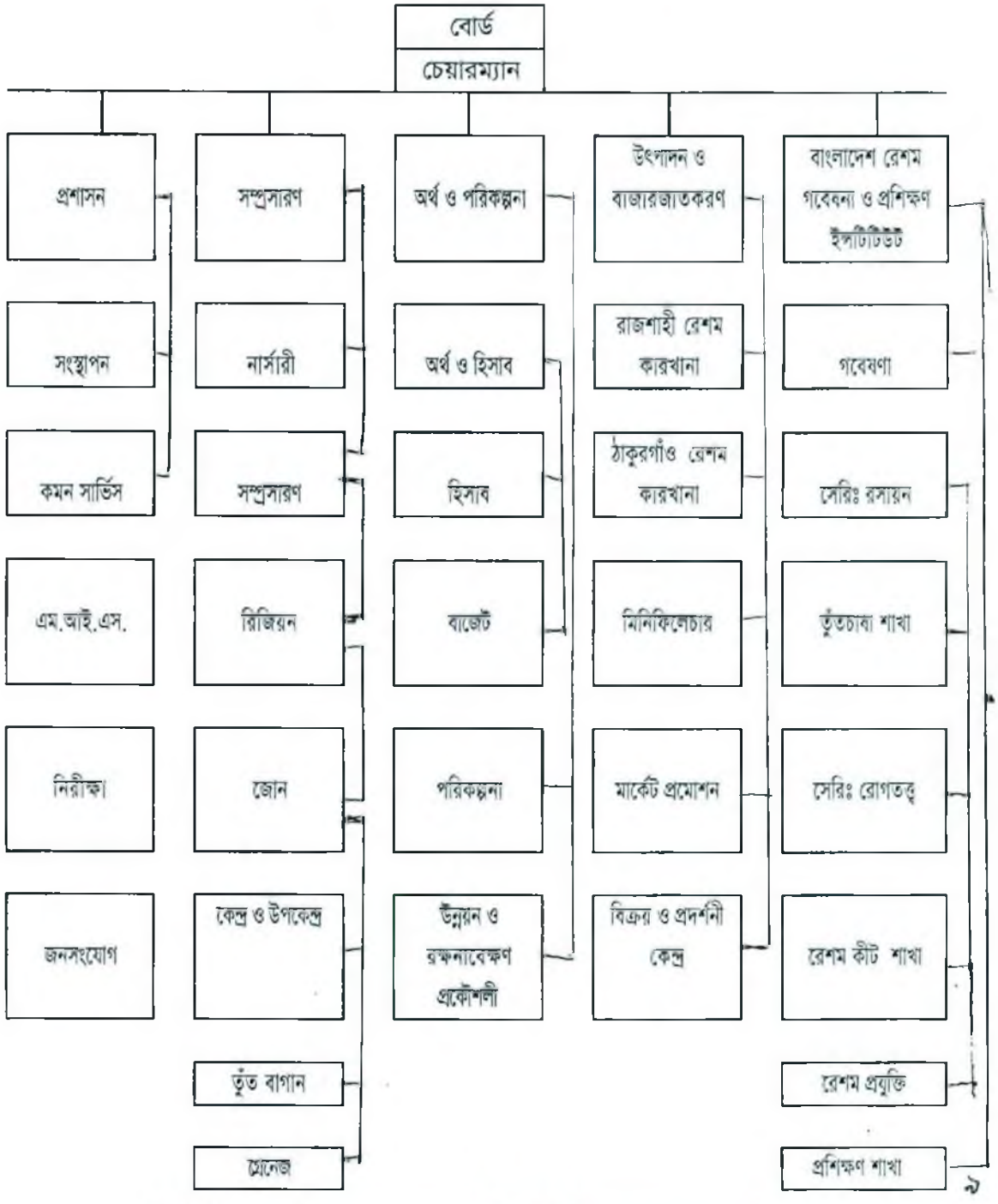

৯. তথ্য ঃ তথ্য ও পরিসংখ্যান-৯৪, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, পৃ. ২, ৭, ৮

Dhaka University Institutional Repository

(৮) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ঃ BSRTI

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSRTI) বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ রেশম বোর্ডকে সহায়তাকারী দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বি এস আর টি আই প্রধান কারিগরী সহায়তাকারী একটি একক এবং বি এস বি এর মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (EPSIC)-এর অধীনে "Silk-cum-lac Research Institute" এবং Silk Technological Institute -দুইটি বিভাগের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে এই দুইটি ইউনিটকে একত্রিত করে রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নাম দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর যথাযথ পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এর কার্যক্রম স্থির ছিল। এরপর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে নব জীবন সঞ্চারনের জন্য মানব সম্পদ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী পৌরসভার ৪৯.১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের মোট ৫টি গবেষণা শাখা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ-

(১) রেশম শিল্পের যথোপযুক্ত কারিগরী বিষয় সমূহের সংস্কার সাধন এবং ধারণা ও তত্ত্ব প্রচার করা।

(২) কারীগরী সহায়তা প্রদান করা।

(৩) দেশে ব্যাপকভাবে রেশম চাষের বিস্তার এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দক্ষতা সম্পন্ন কারিগরী জনশক্তি সৃষ্টি করা।[১০]

(৯) বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (BSF)

৯০ এর দশকের শুরুতে রেশম শিল্প বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে এবং দিন দিন রেশম শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় ১৯৯৪ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এ লক্ষ্যে এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকারী সংগঠনের সমন্বয়ে একটি পরামর্শমূলক পর্ষদ গঠন করে। এই পরামর্শমূলক পর্ষদ রেশম শিল্পকে পূনর্জাগরণের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার উপদেশ ও সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে FAO এবং বিশ্বব্যাংক সহযোগিতা প্রকল্প মিশন বাংলাদেশ সিল্ক ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (SDP) রিপোর্ট দাখিল করেন। বাংলাদেশ সরকার

---

১০. Bangladesh Sericulture Research & Training Instititue At a Glance, BSRTI, Rajshahi, Page - 1

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালে SDP গ্রহন করে। ১৯৯৮ সালে SDP কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। SDP এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাহায্যে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালনা বোর্ডে রয়েছে সরকারী সংস্থার সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি, রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা, রেশম রপ্তানীকারকদের প্রতিনিধি। সিল্ক ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হল তৃনমূল পর্যায়ে রেশম চাষীদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান, দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর কর্মসংস্থান। সিল্ক বোর্ডের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ- চাষীদের টেকসই ও সহজ লভ্য প্রযুক্তি সরবরাহ, রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, রেশমজাত পন্যের মান উন্নয়ন, রেশম বস্ত্রের বাজারজাতকরণ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন সরাসরি কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে না। তারা বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করে। (তথ্যঃ বাংলাদেশ সিল্ক ফাউণ্ডেশন)

(১০) বাংলাদেশ সুইস দ্বিপাক্ষিক প্রকল্প : **Bangladesh Swiss Bilateral Project**

রেশম চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই (ডিসেম্বর ১৯৭৭)-এর উপর ভিত্তি করে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ এবং সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সুইস দ্বিপাক্ষিক প্রকল্প তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রকল্পের জাতীয় স্তরের উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) নানাবিধ তুঁতজাত এবং রেশম পোকার প্রজাতির উন্নয়ন, (২) গবেষনা ও প্রশিক্ষণকে জোড়ালো করা এবং (৩) গবেষণা, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত উপকরণ সরবরাহ।

কিছু নির্দিষ্ট এলাকার জন্য-এর উদ্দেশ্যগুলো হল-(১) ২৬০০ নির্বাচিত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ৪০০ ভূমিহীন কৃষকের জন্য টিকে থাকার মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং (২) সমন্বিত সম্প্রসারণমূলক সেবা, ভর্তূকী এবং ঋণের স্কীমের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা।[১১]

---

11. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS, 1988, P. 164

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

(১) বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (BRAC)

বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি ((BRAC) ব্র্যাক হচ্ছে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যা স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রামের গরীব মানুষের আয়ের পথ সৃষ্টি করা। এটি সিল্ক সেক্টরের ক্যাস্টর গাছের চাষ এবং এন্ডি রেশম গুটি চাষের সাথে জড়িত॥। এটি সাধারণত গ্রামের গরীব মানুষকে ক্যাস্টোর বীজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে। প্রাথমিকভাবে এটির কার্যক্রম মানিকগঞ্জ, সাভার এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্যান্য জায়গাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেশের অন্যান্য অংশে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পরে। এন্ডি সিল্ক এর পাশাপাশি তুঁত রেশমের ক্ষেত্র ও তাদের কাজ সম্প্রসারিত করতে থাকে। বর্তমানে এটি তুঁত চারা এবং রেশম ডিম সরবরাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এগুলি তারা রেশম বোর্ডের কাছে থেকে ক্রয় করে তা প্রাইভেট সেক্টরের তুঁত চাষী এবং পলু পালনকারীদের সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও এটির তুঁত চারা উৎপাদন এবং সরবরাহের নিজস্ব কর্মসূচী রয়েছে। এ ছাড়াও ব্র্যাক রেশম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে ঢাকার আড়ং এর মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে।

(২) রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (RDRS)

আর ডি আর এস বিশ্বে লুথার অনুসারী সংঘের একটি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান (Department of world service, Geneva) যা বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার যুদ্ধ বিধ্বস্ত গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল। অন্যান্য কর্মসূচী ও কাজ ছাড়াও আর.ডি.আর.এস. রেশম চাষ এবং রেশম শিল্পের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছয়টি ছোট তুঁত বাগান এবং একটি রেশম কারখানা (TSF) গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮১ সালের শেষে এই রেশম চাষের কর্মসূচী তারা রেশম বোর্ডকে উপহার হিসাবে প্রদান করে। বর্তমানে তারা রেশম বোর্ডের কাছ থেকে তুঁত চারা এবং রোগমুক্ত রেশম ডিম (DFL) নিয়ে তা তুঁত চাষী এবং বসনীদের মধ্যে সরবরাহ করছে। তুঁত চারাগুলো বোর্ড বিনামূল্যে সরবরাহ করে এবং রোগমুক্ত রেশম ডিম ভর্তূকী মূল্যে সরবরাহ করে। এ ছাড়াও আর.ডি.আর.এস. -এর সূতা তৈরীর চরকা এবং তাঁত গ্রামের গরীব

Dhaka University Institutional Repository

জনগণকে দান করার কর্মসূচী রয়েছে। এগুলো ছাড়াও আর.ডি.আর.এস এন্ডি সূতা তৈরীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে এবং বিকেন্দ্রীয়ভাবে রিলিং মেশিন স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

(৩) প্রশিকাঃ (Proshika)

প্রশিকা হচ্ছে আর একটি এনজিও, যার লক্ষ্য হল গ্রামীন এলাকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, তাদের আয় বৃদ্ধি করা এবং দারিদ্রতা দূর করা এছাড়াও রেশম চাষের উন্নতির সহায়ক কার্য সম্পাদন। এই প্রতিষ্ঠান এন্ডি রেশম চাষ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু অসন্তোষজনক ফলাফলের কারণে ১৯৭৯/৮০ সালের দিকে তারা এটি বাদ দিয়ে দেয়। বর্তমানে চালু হওয়া রেশম চাষের প্রকল্পটি প্রশিকা ১৯৮৪ সালে চালু করে। এটার কেন্দ্র মানিকগঞ্জের মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রকে ঘিরে রয়েছে এবং সেখানে কার্যপ্রণালী প্রদর্শনকারী তুঁত চাষের জমি রয়েছে। এই কেন্দ্রটি সম্ভাবনায় পলু পালনকারী, সূতা প্রস্তুতকারী এবং তাঁতীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কাছ থেকে রোগমুক্ত ডিম সংগ্রহ করে প্রশিকার মাধ্যমে সংগঠিত কিছু দলকে তারা এগুলো বন্টন করে থাকে। মানিকগঞ্জ ছাড়াও প্রশিকা তাদের রেশম কার্যক্রম ডোমার, শ্রীপুর, দেবীগঞ্জ ইত্যাদি জায়গাতেও চালিয়ে থাকে।

(৪) সুইডিশ ফ্রি চার্চ এইড (SFCA)

সুইডিশ ফ্রি চার্চ এইড বিশেষত:বৃহত্তর রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া জেলার ল্যাথারিজম আক্রান্ত ব্যক্তি এবং আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্যই মূলত:নিয়োজিত হয়। এর রেশম চাষ কর্মসুচীর অধীনে তারা এন্ডি স্পিনিং চরকা নির্দিষ্ট কিছু লোককে সরবরাহ করে এবং তাদের দ্বারা তৈরীকৃত সূতা SFCA -এর মাধ্যমেই বাজারজাত করে।

(৫) মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স সোসাইটি (MIDAS)

মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স সোসাইটি বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক সেবাদানকারী সংগঠন, বহু জাতিক এজেন্সীর সমন্বয়ে গঠিত একটি সমিতি। এটি ক্ষুদ্র এবং মাঝারী ধরণের শিল্প উদ্যোগ গ্রহণকারীকে আর্থিক সহায়তায় দান করে। রেশম ক্ষেত্রে এটি ৪টি সূতা প্রস্তুতকারী ইউনিটকে অর্থ সংস্থান করেছে। এই ইউনিটগুলোর ২টি ভোলাহাটে, একটি রাজশাহীতে এবং অন্যটি নয়নসিংহে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) কো-অপারেশন অব আমেরিকান রিলিফ এভরিহয়্যার (CARE)

কো-অপারেশন অব আমেরিকান রিলিফ এভরিহয়্যার একটি আন্তর্জাতিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ সরকারের (Integrated & Rural Development Programme) ইনটেগরেটেড রুরাল ডেভেলপমন্টে প্রোগাম (IRDP) এর সাথে সংযুক্ত হয়ে চারটি উপজেলা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের এন্ডি রেশমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য একটি কর্মসূচী চালু করে। এই সমস্ত উপজেলাগুলো হল ঢাকা জেলার কতোয়ালী, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর এবং মির্জাপুর এবং গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর। এই কর্মসূচীগুলোর উপর একাধিক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে বিভিন্ন কারণে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়নি। এন্ডি রেশম চাষ-এর সদস্যদের আত্মরক্ষা মূলক কার্যক্রমে পরিণত হয়। বর্তমানে CARE খুব বেশী রেশম কার্যক্রমের সাথে জড়িত নেই।[১২]

২.৮ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত রেশম কারখানাসমূহ

(ক) রাজশাহী রেশম কারখানা (RSF)

উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে এ অঞ্চলে রেশম কার্যক্রম সম্পর্কিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ভারতের অন্তর্ভূক্ত মুর্শিদাবাদ, মালদাহ ও অন্যত্র অবস্থিত ছিল। ফলে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলাদেশের যে অংশে রেশম সম্প্রসারণ এলাকা ছিল তার দেখাশুনা ও অতিরিক্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং দেশে উৎপাদিত রেশম গুটি ও সূতার সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প ও বানিজ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৫৯ - ৬০ সালে রাজশাহী শহরে রাজশাহী রেশম-কারখানা নামে একটি মডেল প্রকল্প স্থাপনের কাজ শুরু হয়। কারখানাটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ-

(১) বেসরকারী খাতে রেশম গুটি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদিত গুটি বিক্রয়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য "শক এ্যবজর্বিং প্রকল্প" হিসেবে কাজ করা।

(২) রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিল্প স্থাপন করা।

---

12. Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance. Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS, 1988, P. 157,159

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদনকারীদের উৎসাহ প্রদানকারী প্রকল্প হিসাবে কাজ করা।

১৯৬২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে কারখানার উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৬৩ সালে কারখানা পরিচালনার ভার তদানীন্তন ইপসিকের (পুর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও শিল্প সংস্থা) নিকট হস্তান্তরিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেশম শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের সৃষ্টি হলে রাজশাহী রেশম কারখানাটি বিসিক কর্তৃক বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কারখানাটি প্রাথমিকভাবে ১০০টি রিলিং বেসিন, ২৩টি শক্তি চালিত তাঁত ও ১৩টি হস্তচালিত তাঁতের জন্য তৈরী হলেও পরবর্তীতে আরও ১০০টি রিলিং বেসিন ও ২০টি শক্তি চালিত তাঁত এর সাথে সংযুক্ত হয়।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ কারখানাটি লাভজনক হিসাবে পরিচালিত হয়। এরপর থেকে এটি লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকে। রেশম বোর্ডের সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত রেশম গুটির বাজার নিশ্চিত করণের জন্য " শক এবজর্বিং " প্রকল্প হিসাবে কাজ করায় এবং বহুল ব্যবহারে সময়ের ব্যবধানে সংস্থাপিত যন্ত্রপাতি ও ভবনসমূহ পুরানো হয়ে পড়ায় কারখানাটি বিরাট অংকের লোকসান দেয়। এ অবস্থা দূরীকরণ ও কারখানাটিকে লাভজনকভাবে, কমপক্ষে না লাভ না ক্ষতি পর্যায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে কারখানাটির জন্য সরকার কর্তৃক ৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিএমআরই প্রকল্প অনুমোদিত হয়। বিএমআরই প্রকল্পের কাজ ১ জুলাই ১৯৯৫ তারিখে শুরু হয়ে ৩০শে জুন ১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ২০০০ সালের মার্চ মাস থেকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হয়।

বিএম আর ই পূর্ব এবং বিএম আর ই উত্তর অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ-

১. স্থাপনের বৎসর ঃ ১৯৬১ ইং

২. উৎপাদন শুরুর বৎসর ঃ ১ জানুয়ারী ১৯৬২ ইং

৩. ভূমির পরিমানঃ ১১. ২১৮৫ একর

৪. প্রকল্পের মূল্য ঃ অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত হল ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	প্রাক্কলিত		সংশোধিত	
	বছর	টাকা লক্ষ	বছর	টাকা লক্ষ
১ম দফা	১৯৫৯ -৬০	২০.৫৬	১৯৬৩ -৬৪	২৯.০০
২য় দফা	১৯৭৩ -৭৪	৬১.০০	১৯৭৮ - ৮৯	১০৩.৩৮
৩য় দফা (বিএমআরই)	১৯৯৫ -৯৯	৬০০.০০	১৯৯৫-৯৯	৫৬৫.৯০

৫. পরিসম্পদের মূল্য ঃ টাকা

(ক) বুক ভ্যালু টাকা ৫৮৩.৭৩ (১৭.৮৩ + ৫৬৫.৯০) লক্ষ

(খ) রাজস্ব মূল্য টাকা ১২২০.৯০ (৬৫৫.০০ + ৫৬৫.৯০) লক্ষ

৬. মুখ্য উৎপাদন যন্ত্র পাতিঃ

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির নাম	একক	চালু		বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ কেজি / মিটার)	মন্তব্য
			পুরাতন	চালু		
(ক)	রিলিং মেশিন	সংখ্যা	৮০	-	০.০১৫	বি এম আর ইউওর ১০টি বেসিন চালানো হবে।
(খ)	হস্তচালিত তাঁত	সংখ্যা	১২	১০	০.২৯	২ শিফ্‌ট হিসাবে
(গ)	শক্তি চালিত তাঁত	সংখ্যা	৩৫	১৯	৪.৩৩	৩ শিফ্‌ট হিসাবে
(ঘ)	স্ক্রীন প্রিন্টিং টেবিল	সেট (৪টি)	১	--	০.৪০	১ শিফ্‌ট হিসাবে
(ঙ)	ব্লক প্রিন্টিং টেবিল	সংখ্যা	৮	--	০.২৩	
(চ)	ফ্ল্যাট বেড স্ক্রীন প্রিন্টিং মেশিন	সংখ্যা	--	১	৭.২০	২ কালারের উপর ভিত্তি করে। ১ শিফ্‌ট হিসাবে।

৭. জনবলঃ

বিবরণ	অনুমোদিত	প্রকৃত কর্মরত	অতিরিক্ত / ঘাটতি
কর্মকর্তা	১৭	১২	(-) ৫
কর্মচারী	৯২	৫৮	(-) ৩৪
শ্রমিক	৩৬২	২৬৪	(-) ৯৮
মোট	৪৭১	৩৩৪	(-) ১৩৭

১৩. বি.এম.আর.ই ঃ অর্জন ও প্রভাব উদ্ভূত সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশ, রাজশাহী রেশম কারখানা, ২৯ অক্টোবর, ২০০০সাল, পৃ. ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ৬ কোটি টাকা ব্যয় করে কারখানার বিএমআরই প্রকল্পটি বা আধুনিকায়ন বা সংস্কার প্রকল্পটি চালু করা হয় তথাপিও কারখানার সমস্যার সমাধান খুব একটা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে ২০০২ সালের ৩০ শে নভেম্বর সরকারের নির্দেশ ক্রমে এই কারখানাটি বন্ধ ঘোষনা করা হয়।

ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা (TSF)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বৃহত্তর বংপুর দিনাজপুর জেলার যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনগণের কর্ম সংস্থানের জন্য আর ডি আর এস তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এর সাথে সাথে তারা রেশম চাষ এবং রেশম শিল্প সম্পর্কিত কার্যাবলীও শুরু করে। এই প্রেক্ষিতে তারা ঠাঁকুরগাও-এ একটি রেশম কারখানা তৈরী করে। ১৯৮১ সালের শেষের দিকে তারা এই কারখানাটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করে। এই রেশম কারখানায় মোট ২০টি রিলিং বেসিন ১৯টি হস্তচালিত তাঁত এবং ৩টি শক্তি চালিত তাঁত রয়েছে। যদিও এই কারখানায় আমাদের দেশী খাঁটি রেশম তৈরী হয় তথাপিও বিভিন্ন সমস্যার কারণে এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো হল অতিরিক্ত জনবল,পুরাতন যন্ত্রপাতি, রেশম সূতার অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রশিক্ষণের অভাব, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে প্রতিবছর লোকসান দিতে থাকলে ২০০২ সালের ৩০শে নভেম্বর সরকারী নির্দেশে একই সাথে ঠাঁকুরগাঁও রেশম কারখানা এবং রাজশাহী রেশম কারখানা দুটিই বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমাদের দেশে মাত্র এই দুটি কারখানাই সরকারী যেখানে খাঁটি রেশম তৈরী হত যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.২

রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানায় আয় ও ব্যয় বিবরণ

	রাজশাহী রেশম কারখানা			ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা		
আর্থিক বছর	আয়	ব্যয়	লাভ-লোকসান আয় দ্বারা ব্যয় মিটানোর শতকরা হার	আয়	ব্যয়	লাভ-লোকসান আয় দ্বারা ব্যয় মিটানোর শতকরা হার
১৯৮১-৮২	১৬০.৮৮	১৮৩.৬৩	(-)২২.৭৫ ৮৭.৬১	৮.১০	১৮.৮৭	(-) ১০.৭৭ ৪২.২৯
১৯৮২-৮৩	১৭৪.৫৮	২১৩.৪৯	(-)৩৮.৯১ ৮১.৭৭	১২.৩৬	১৭.৬৮	(-)৫.৩২ ৬৯.৯০
১৯৮৩-৮৪	১১৮.৩৭	১৪৩.৮২	(-)২৫.৪৫ ৮২.৩০	১২.৬২	১৭.৬২	(-)৪.৩৪ ৭৭.২৯
১৯৮৪-৮৫	৭৬.৩২	১২৬.৭৮	(-)৫০.৪৬ ৬০.১৯	১৩.২৯	২৫.৬০	(-)১২.৩১ ৫১.৯১
১৯৮৫-৮৬	৯৯.২৪	১৪৭.৭২	(-)৪৮.৪৮ ৬৭.১৮	১৫.৩৮	২৭.৮৭	(-)১২.৪৯ ৫৫.১৮
১৯৮৬-৮৭	১৪৫.৬৯	২০৯.২৩	(-)৬৩.৫৪ ৭৯.৬৩	১৫.০০	২৪.৫৫	(-)৯.৫৫ ৬১.০৯
১৯৮৭-৮৮	১৩৭.০৫	২০৪.৬৮	(-)৬৭.৮৩ ৬৬.৯৫	১৫.০৪	৩৩.৫৪	(-)১৮.৫০ ৪৪.৮৪
১৯৮৮-৮৯	১৫০.০০	১৮০.১৫	(-)৩০.১৫ ৮৩.৩৩	১৮.৬৪	৪৬.০৪	(-)২৭.৪০ ৪০.৪৮
১৯৮৯-৯০	১২৮.৬৯	১৬৫.৬৫	(-)৩৬.৯৬ ৭৭.৬৮	১৭.৬১	৪৩.০৫	(-)২৪.৪৪ ৪০.৯০
১৯৯০-৯১	১১০.৫৭	১৫৯.০০	(-)৪৮.৪৩ ৬৯.৫৪	১১.০৩	২৯.৬৭	(-)১৮.৬৪ ৩৭.১৭
১৯৯১-৯২	১০১.৮৩	১৬৪.৭৪	(-)৬২.৯১ ৬১.৮১	২৫.১৩	৪৭.৬২	(-)২২.৪৯ ৫২.৭৭
১৯৯২-৯৩	১২৮.৯০	২১৮.০৮	(-)৮৯.১৮ ৫৯.১০	১০.৬৮	৪৩.৬১	(-)৩২.৯৩ ২৪.৪৮
১৯৯৩-৯৪	১০১.৯২	২০৮.৬৭	(-)১০৭.৭৫ ৪৮.৬০	১৪.০৮	৪৮.৭৫	(-)৩৪.৬৭ ২৮.৮৮
১৯৯৪-৯৫	১৩৬.৫৮	২২৩.৭২	(-)৮৭.১৪ ৬১.০৪	১৮.৬৩	৫১.৭১	(-)৩৩.০৮ ৩৬.০২
১৯৯৫-৯৬	১৪৬.৫৮	২৪০.০৩	(-)৯৩.৫২ ৬১.০৩	৮.৪৪	৫১.৬৭	(-)৪৩.২৩ ১৬.৩৩
১৯৯৬-৯৭	৮৪.৭৯	২০৫.৪২	(-)১২০.৬৩ ৪১.২৭	৮.৪৪	৫২.৭৩	(-)৪৪.২৯ ১৬.০০
১৯৯৭-৯৮	৪৩.৪৯	১৮৬.৫২	(-)১৪৩.০৩ ২৩.৩১	৯.৯৭	৪৯.২০	(-)৪৫.২৩ ৮.৩৬
১৯৯৮-৯৯	৪৬.৯১	২০২.০৮	(-)১৫৫.১৭ ২৩.২১	৪.৯০	৫১.০২	(-)৪৬.১২ ৯.৬০
১৯৯৯-২০০০	১২২.৪৫	২৮৭.৯২	(-) ১৬৫.৪৭ ৪২.৫২	২.২৩	৫১.৪০	(-)৪৯.১৭ ৪.৩৩

তথ্যঃ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।

সারণী ঃ ২.৩

বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের কর্মকাণ্ডের বাস্তব অগ্রগতি

কর্মকান্ড	একক	৭৯-৮০	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
১। তুঁতচারা রোপন	লক্ষ সংখ্যা	৩.০০	৫.৫৭	৮.৯৬	৫.৭৬	১৪.৮৩	১৪.৪০	১৭.০০	২৬.০০	২২.৫৫	৪৮.৩৮	৭২.৫৮	৮৬.০০	২০.৩০	৫.৪৮	০.৫৯	১.১৩	১.০৮	১.৮১
২। টিকে থাকা তুঁত চাষ (সম্প্রঃ একক)	হেক্টর	৩৭৫	১৪০৩	১৩৯০	১৭০৩	২২৫৫	২২২৫	৩২০০	৩৯২৭	৪৬৬৭	৮১৩৬	১১৫৮৬	১১৮৭৮	২৫৭৬	২০১৫	১৬১৬	৯০৭	৫২৮	৭২৭
৩। রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	লক্ষ সংখ্যা	২১.০০	২৩.৩২	২৪.০০	২৪.১০	২১.৮৫	২৫.৬৬	৩১.০০	২৫.৬৩	২৩.৩৮	৩১.৩৭	৩১.৪৭	৫২.১০	১৪.৪১	১৩.১৯	৮.২২	৬.০০	৪.৩০	৩.৭৭
৪। বাণিজ্যিক রেশম গুটি উৎপাদন (রেশম বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিমসমূহ হতে)	লক্ষ কেজি	৪.০১	৩.৯৩	৪.৩৪	৪.৬৯	৪.৭৭	৪.৬৬	৫.৬২	৪.৬৪	৪.০২	৫.০৫	৫.৬১	৮.০৪	৩.২১	২.৯৮	১.৯৮	১.৪৬	১.০৫	০.৯৬
৫। কাঁচা রেশম উৎপাদন (বোর্ডের সরবরাহ ডিম হতে উৎপাদিত কাঁচা রেশম) (ক) মোট (খ) সমরকারী খাত	হাজার কেজি	২৪.৯৫ ৫.৬৭	২৪.৪৯ ৩.২৩	২৭.০০ ৩.১১	২৯.০০ ৪.৪২	২৯.৫০ ৩.৩৬	২৮.১৯ ৪.৩৬	৩৪.৭০ ৫.৪১	২৯.০৫ ৩.৪০	২৫.১২ ১.৬৩	২৮.৫৭ ৩.৫৪	৩১.৬৯ ৩.২৭	৪৩.১৭ ০.৪৬	৫৮.৪৬ ২.৩৮	৪৯.৭৪ ১.৮০	১৭.০৭ ০.৫০	১৫.০০ ০.৫৩	৮.৩৪ ১.৩১	৬.৬৭ ১.২৪
৬। কাপড় উৎপাদন (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিম হতে উৎপাদিত সূতা দ্বারা) (ক) মোট (খ) সরকারী খাত	লক্ষ মিটার	৪.০২ ০.৬৭	৩.৯৫ ০.৬৩	৪.৩২ ০.৪৪	৪.৪৮ ০.৫৩	৪.৭২ ০.৬২	৪.৫১ ০.৮৬	৫.৬৩ ০.৭৯	৪.৬৫ ০.৫৯	৪.০২ ০.৪৪	৫.৫৭ ০.৪৯	৫.৬১ ০.৬৪	৬.৯০ ০.৬৭	৯.৭০ ০.৬৬	৮.০০ ০.৩৯	৩.১২ ০.১৫	২.৭৯ ০.০৯	১.৭৮ ০.২৭	০.৮৭ ০.৫৯
৭। প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩০০	১১১	২৬২	৭৬২	৮৬২	৮৬২	৫৬৬	৯৪.০০	৬২৮	৪২৩	২০৯৬	১৪৫৭	১৪৭৬	২৮৭	--	৬০০	৯৯৫	৫০০
৮। কর্ম সংস্থান (ক্রমপুঞ্জিত)	লক্ষ সংখ্যা	০.৩৫	০.৫৩	০.৬২	০.৬৫	১.৪০	১.৬০	২.৮০	২.০০	২.৫০	৩.০০	৪.০০	৪.২০	৪.৫০	৫.০০	৫.২	৫.৩০	৫.৫০	৫.৭৫

তথ্যঃ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ঃ

গবেষণা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যার দ্বারা সত্য ও সঠিক তথ্য আহরণ করা যায় এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। গ্রীনের মতে " জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগকেই গবেষণা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।"[১] আরও পরিস্কারভাবে বলা যায় যে গবেষণা একেবারে অজানা বিষয়কে জানা নয় বরং যা সম্পর্কে অল্প জানা আছে তাকে সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট করে জানাকেই গবেষণা বলে।

গবেষণা ক্ষেত্রে সাধারণত: দুই ধরণের গবেষণা পরিলক্ষিত হয়। (১) মৌলিক গবেষণা (২) ফলিত গবেষণা।

এই গবেষণা মৌলিক এবং ফলিত উভয় গবেষণার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বেশীর ভাগটাই সামাজিক গবেষণার অন্তর্ভূক্ত।

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে দুই ধরণের উৎস ব্যবহৃত হয়েছে যথা ঃ প্রাথমিক উৎস ও মাধ্যমিক উৎস। নিম্নে এই দুই উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ -

৩. ১ প্রাথমিক উৎসঃ

প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ৫টি সমগ্রকের জন্য পাঁচটি প্রশ্নমালা প্রনয়ন করা হয়। এই পাঁচটি সমগ্রক হচ্ছে (১) তুঁত চাষী (২) পলুপালনকারী (বসনী) (৩) সূতা প্রস্তুতকারী (৪) কাপড় বুননকারী বা বস্ত্র উৎপাদনকারী (৫) খুচরা ব্যবসায়ী। চুড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রনয়নের পূর্বে খসড়া প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রথমে গবেষণা এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করি। তারপর এর ওপর ভিত্তি করে চুড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরী করি। প্রশ্নপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও বদ্ধ দুই ধরণের প্রশ্নই রাখা হয়। উপরোক্ত ৫টি সমগ্রকের প্রত্যেকটি সমগ্রকের জন্য ২০ জনকে নমুনা হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ মোট ১০০ জনের কাছ থেকে প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ ছাড়াও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

---

১. সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, নাজমির নূর বেগম, জ্ঞান বিকাশ, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু রেশম শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগই অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত সেহেতু এই সমস্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ আমার গবেষণা কাজকে পরিপুর্ণতা দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৩.২ মাধ্যমিক উৎসঃ

এই গবেষণায় মাধ্যমিক উৎস থেকেও অনেক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্রিকা, জার্নাল, রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন ও প্রকাশনা, থিসিস ইত্যাদি থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করি। এই সমস্ত বই-পুস্তক ও তথ্যাদি যে সমস্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নে তা দেখান হ'ল-

(১) বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, রাজশাহী।

(২) রাজশাহী রেশম কারখানা, রাজশাহী।

(৩) আই. বি. এস. লাইব্রেরী, রাজশাহী।

(৪) বাংলাদেশ রেশম গবষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।

(৫) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(৬) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৭) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, (BIDS) ঢাকা।

(৮) বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

(৯) ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১০) বরেন্দ্র জাদুঘর লাইব্রেরী, রাজশাহী।

(১১) ভোলাহাট মিনিফিলেচার, ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ।

(১২) ভোলাহাট বীজাগার, ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ।

(১৩) মীরগঞ্জ বীজাগার ও মিনিফিলেচার, বাঘা, রাজশাহী।

৩.৩ গবেষণা এলাকাঃ

এই গবেষণায় এলাকা ছিল মুলতঃ রাজশাহী এবং নবাবগঞ্জ জেলার কিছু অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলোকে আমি নমুনা এলাকা হিসাবে ব্যবহার করেছি। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলগুলো এক সময় রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলো হল

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া ও বাঘা উপজেলা এবং নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট উপজেলা। নিম্নে এ সমস্ত এলাকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বোয়ালিয়াঃ রাজশাহী হচ্ছে রেশম শিল্পের ঐতিহ্যবাহী স্থান। অতীতে বাংলাদেশে রেশম শিল্প এই রাজশাহীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। রাজশাহী জেলা সদরে মোট ২টি উপজেলা রয়েছে পবা ও বোয়ালিয়া। রাজশাহীতে রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা মূলত বোয়ালিয়াতেই গড়ে উঠেছে। এই বোয়ালিয়া উপজেলার মোট আয়তন ২৩৮.৭৭ বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মোট লোক সংখ্যা ৪,৮৯,৬২০ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২,৫৭,৪৪০ এবং মহিলার সংখ্যা ২,৩২,১৮০ জন (তথ্য সূত্র ঃ আঞ্চলিক পরিসংখান অফিস, রাজশাহী)।

এই বোয়ালিয়াতেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (BSB), বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSRTI) এবং রাজশাহী রেশম কারখানা (RSF)। এছাড়া সপুড়ার বিসিক শিল্প নগরীতে গড়ে উঠেছে প্রচুর রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী রেশম সূতার সাহায্যেই বস্ত্র তৈরী হচ্ছে। আমি এই সমস্ত বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে রেশম কাপড় বুনন বা রেশম বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য প্রশ্নমালার সাহায্যে সংগ্রহ করি।

এখানকার সাহেব বাজার এলাকায় রয়েছে অনেক খুচরা ব্যবসায়ী। যারা এই রেশম বস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত। আমি এই খুচরা ব্যবসায়ীদের ২০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে রেশম বস্ত্র বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি।

মীরগঞ্জ (বাঘা)ঃ রাজশাহীর অদূরে অবস্থিত বাঘা উপজেলার আয়তন ১৮৪.২৫০ বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মোট লোক সংখ্যা ১,৬৭,৭০০। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮৮.১২০ এবং মহিলার সংখ্যা ৭৯,৫৮০ (তথ্য সূত্রঃ আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী)

বাঘা উপজেলার মীরগঞ্জ রেশম চাষের জন্য এক সময় বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে এখানে রেশম বোর্ডের একটি তুঁত নার্সারী এবং একটি মিনিফিলেচার রয়েছে। এখানকার অনেক মানুষ এখনও তুঁত চাষ এবং রেশম কীট পালনের সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই এলাকা থেকে আমি প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫ জন তুঁত চাষী এবং ৫ জন পলু পালনকারীকে (বসনী) নির্বাচন করি।

Dhaka University Institutional Repository

ভোলাহাটঃ ভোলাহাট হচ্ছে ভারতীয় সীমান্তবর্তী নবাবগঞ্জ জেলার ছোট্ট একটি উপজেলা। এই উপজেলার মোট আয়তন ১২৩.৫২ বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মোট লোকসংখ্যা ৯২,১৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪৬,৬০৯ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৪৫.৫৪০ জন (তথ্যঃ নবাবগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান অফিস)।

এক সময় ভোলাহাটকে রেশমের সূতিকাগার নামে আখ্যায়িত করা হত। এখানকার লোকজন বহুকাল আগে থেকেই কোন না কোন ভাবে রেশম চাষের সাথে জড়িত ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় ভারতের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার জঙ্গিপুর, কালিয়াচক ও সুজাপুর অঞ্চল হতে বেশ কিছু আদি রেশম চাষী ভোলাহাটে এসে ব্যাপকভাবে রেশম চাষ শুরু করে। এ সময় এখানে একটি রেশম প্রদর্শন কেন্দ্র ছিল। ১৯৬১ - ৬২ সালের দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রেশম শিল্পকে সম্প্রসারণ ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসাবে ১১১ বিঘা জমির উপর ভোলাহাটে একটি রেশম বীজাগার স্থাপিত হয়। পাকিস্তান আমল থেকে আশির দশক পর্যন্ত দেশের মোট উৎপাদনের ৭৫% ভাগ রেশমগুটি ও সূতা এ উপজেলাতেই উৎপাদিত হতো বলে জানা যায়। (তথ্যঃ বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন)

আমি ভোলাহাট এলাকা থেকে ১৫ জন তুঁতচাষী, ১৫ জন পলু পালনকারী এবং ১৫ জন সূতা প্রস্তুতকারীসহ মোট ৪৫ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহ করি।

শিবগঞ্জঃ শিবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। এর আয়তন ৫২৫.৪৩০ বর্গ কিঃ মিঃ। এর মোট লোক সংখ্যা ৫,০৮,০৯২। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২,৬১,৭১৩ জন এবং মহিলার সংখ্যা ২,৪৬,৩৭৯ জন। এই এলাকায় মূলত রেশম সূতা এবং কাপড় তৈরী হয়ে থাকে। এখানে প্রচুর তাঁতী রয়েছে যারা এই রেশম কাপড় তৈরীর সাথে জড়িত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আমি শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট, লাহাড়পুর এবং সদর উপজেলা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। এখানকার ৫ জন সূতা প্রস্তুতকারী এবং মোট ১২ জন তাঁতীর কাছ থেকে প্রশ্নমালার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত এবং রেশম কাপড় বুনন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করি। নিম্নে কোন এলাকা থেকে কতজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তা ছকের মাধ্যমে দেখান হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩.১

তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এলাকা ভিত্তিক বন্টন

রেশম শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পক্ষসমূহ	বোয়ালিয়া	মীরগঞ্জ (বাঘা)	ভোলাহাট	শিবগঞ্জ	মোট	শতকরা হার
তুঁত চাষী		০৫	১৫		২০	২০%
পলুপালনকারী (বসনী)		০৫	১৫		২০	২০%
সূতা প্রস্তুতকারী			১৫	০৫	২০	২০%
কাপড় বুননকারী	০৮			১২	২০	২০%
খুচরা ব্যবসায়ী	২০				২০	২০%
মোট	২৮	১০	৪৫	১৭	১০০	১০০%

৩. ৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

এই গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়। এই সমস্যাগুলোর কারণে আমার গবেষণা বিষয় যতখানি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম ততখানি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি। নিম্নে এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(১) প্রথমত: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ রেশম শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত। ফলে তারা এই শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করতে পারেনি। তাছাড়া এই শিল্পের সাথে জড়িত থেকে কতখানি লাভ বা কতখানি লোকসান হচ্ছে সেগুলোর হিসাবও তারা রাখে না। এটাও হচ্ছে অশিক্ষার কারণে। ফলে তারা পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলোও সঠিকভাবে দিতে পারে না।

(২) তাছাড়া এই শিল্পের সাথে জড়িত যে সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে সেখানকার কর্মকর্তাদের অনেকেই সঠিক তথ্য প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেছে। কারণ তারা মনে করে এতে তাদের প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে বা তারা বিপদের সম্মুখীন হবেন।

(৩) বাংলাদেশের রেশম শিল্প সম্পর্কিত বই-পুস্তকের সংখ্যাও অনেক কম। এ ছাড়া ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে এই শিল্পের উপর পরিচালিত গবেষণার সংখ্যাও খুবই

Dhaka University Institutional Repository

কম। ফলে এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং পর্যাপ্ত তথ্য উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

(৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে যেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানই সঠিক সময়ে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলো উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

(৫) বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা একটি ব্যাপক বিষয় যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা কষ্টকর। এক্ষেত্রে নমুনা এলাকার সংখ্যা আরও বেশী করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও অর্থনৈতিক কারণে তা সম্ভবপর হয় নাই।

(৬) গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক সমস্যাও একটা বিরাট সমস্যা। কারণ এই গবেষনা পরিচালনা করতে যেয়ে আমি কোন আর্থিক সহায়তা পাইনি। পুরোপুরি নিজেকেই এই অর্থের যোগান দিতে হয়েছে। কাজেই গবেষণা পরিচালনায় গবেষকদের সবাইকেই আর্থিক সুবিধা দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

সবশেষে এটুকু বলতে চাই উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো থাকা সত্বেও আমার যতটুকু সাধ্য আমি চেষ্টা করেছি আমার গবেষণাকে সফলভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

৩.৫ প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তকের পর্যালোচনা ঃ

রেশম শিল্প সম্পর্কে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি। তবে এই সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে ডাব্লিউ. ডাব্লিউ. হানটার-এর A statistical Account of Bengal, (Bogra and Rajshahi) এল.এস. এস. ওমেলীর এর Bengal District Gazetteer (Bogra and Rajshahi), জি. এন. গুপ্ত এর " A Monograph of the silk Fabrics of Bengal" এবং " Hand Book of Sericulture উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের পূর্বে। এরপর পাকিস্তান আমলে ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (EPSIC) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর দুইটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেগুলোর মধ্যে রেশম শিল্প সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়।

এরপর ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা "Development of Sericulture" নামে একটি প্রকল্প রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট-এ ১২টি নার্সারীর

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকীকরণ, ২২টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ২টি পলুপালনকারী সংস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকে পাকিস্তান আমলে রেশম শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া ১৯৭০ সালে পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা-"A Report on Sericulture Industry in East Pakistan" নামে একটি ষ্টাডি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে রেশম শিল্পের অবস্থা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফাম এর উদ্যোগে শেলী ফিডম্যান "Prospects of Silk Production in Bangladesh" নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল দেশের রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা, দেশী ও বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সরকারের কার্যক্রম পর্যালোচনা, দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন ও দেশের দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের পথ উদ্ভাবন। এই গবেষণটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কারণ এই গবেষণায় আমাদের দেশে তুঁত রেশমের চেয়ে এন্ডি রেশম উৎপাদন বেশী লাভজনক হিসাবে দেখান হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে মাত্র ৬% ভাগ এন্ডি রেশম উৎপাদিত হয় এবং ৮% ভাগ লোক এর সাথে জড়িত। এই এন্ডি রেশমের মান তুঁত রেশমের চেয়ে অনেক নিম্ন। এছাড়াও এ সময়ে কেয়ার (CARE) রেশম শিল্পের উপর একটি জরিপ চালায়। এই জরিপটিও ছিল এন্ডি রেশম চাষের উপর। ১৯৭৭ সালে পি.কুঞ্জী, কে.সেনগুপ্ত ও এল,ভি.সপ্তঋষির তত্ত্বাবধানে "Feasibility Study for a Bangladsh Swiss Development Project in Sericulture" শিরোনামে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন পরিসংখ্যান , রেখাচিত্র, তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর আশির দশকে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু গবেষণা কর্মের নাম উল্লেখ করা হলোঃ-

(i) BIDS (1982) : Sericulture Industry in Bangladesh.

(2) GOB (1982) : Report of the Task for Development of Silk Indusrty.

Dhaka University Institutional Repository

(3) BIBM (1984) : Supply Study on Silk and Silk Production.

(4) BMDC (1984) :Evaluation of Bangladesh Sericulture Board.

(5) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫) ঃ বাংলাদেশের রেশম পন্যের উৎপাদন ও বাজারজাত করণ সমস্যা।

(6) RU : Socio - Economic Viability of Sericulture Industry in Bangladesh.

(7) BIDS (1986) : Supply side study on Sericulture in Bangladesh: Final Report.

(8) BIDs (1988) : Sericulture Industry in Bangladesh: Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials.

(9) BSB (1969) : Silk Sector in Bangladesh: A Selective Review.

উপরোক্ত সবগুলি গবেষণা কর্মই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে বেশীর ভাগ গবেষনায় পুরোপুরিভাবে রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে প্রকাশ করা হয়নি। যে তথ্যগুলো পরিবেশন করা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত তথ্যের অভাব রয়েছে। এগুলোতে পরোক্ষ তথ্যই বেশী পরিবেশন করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত গবেষণা কর্মের দুই একটির গবেষণা কাজ মোটামুটি ভাল সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

নভেম্বর ১৯৮১ সালে Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) এর অধীনে Rural Industry study project এর আওতায় প্রতীমা পাল মজুমদার ও সলিমুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে Sericulture Industry in Bangladesh" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে রেশম শিল্পের সামাজিক অবস্থান, কর্মসংস্থান ও অর্থসংস্থান নিয়ে প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটির মান মোটামুটি উন্নত। এই গবেষণায় অনেক প্রত্যক্ষ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯৮৮ সালের নভেম্বর এ BIDS এর অধীনে জারিদ বখ্‌ত এর তত্ত্বাবধানে ও অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে Sericulture Industry in Bangladesh : Analysis of Production Performance, Constraints and Growth

Dhaka University Institutional Repository

Potentials শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলঃ-

(১) অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরী ও অর্থসংস্থানজনিত দৃষ্টিকোণ থেকে রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা,

(২) এই শিল্পের দুর্বলতা এবং অনুকূল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা,

(৩) অতীতে উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুপারিশ করা। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরণের উৎস থেকেই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রেশম উৎপাদনকারী এলাকায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৯৮৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধীনে দীপকেন্দ্র নাথ দাসের তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশের রেশম পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সমস্যা"। নামে একটি গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল রেশম পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং এই সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দেয়া। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরণের উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণা কাজ মূলতঃরাজশাহী এবং নবাবগঞ্জ জেলার কিছু এলাকাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

এরপর ১৯৮৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধীনে এম.এ. হামিদ এবং অন্যান্যদের সহায়তায় বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের জন্য Silk Sector in Bangladesh: A Selective Review নামে একটি গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়। এই গবেষণা কাজটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজ বলা যায়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রেশম শিল্পের বিভিন্ন পর্যায় যেমনঃ তুঁত চাষ, পলু পালন, সূতা তৈরী এবং রেশম কাপড় তৈরীর বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধা তুলে ধরা। তুঁত এবং রেশমের উচ্চ ফলনশীল জাত এবং রিলিং ও স্পিনিং এর ক্ষেত্রে নুতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা যায় কিনা তা দেখা এবং এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের অর্থনৈতিক দিক পরীক্ষা করা। এ ছাড়া বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং এন্ডি রেশম চাষের সম্ভাবনা তুলে ধরা ছাড়াও এর উদ্দেশ্য ছিল রেশম চাষ কার্যক্রমের কেন্দ্রীকরণ অথবা

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রীকরণ উপযুক্ততা পর্যালোচনা করা। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ধরণের উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রেশম চাষের সাথে জড়িত দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপরোক্ত গবেষণা কাজ ছাড়াও রেশম শিল্প সম্পর্কিত ছোট খাট অনেক গবেষনা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল -

(1) IBA, DU (1989) : A case study on Rajshahi Silk Factory.

(2) BMET Project UGC (1989) : Production of Silk Goods: A Study of Shah Mokhdum Silk Factory, Rajshahi.

(3) BMET Project, RU (June, 1989) : Marketing Problems of Small Scale Industries Production in Bangladesh : A Study of Silk Products in Rajshahi District.

(4) R.U. (1989): Financial Problems of Rajshahi Silk Factory.

(5) BMET Project, RU (1988) : Activity level of Reeling Section In Rajshahi and Thakurgaon silk Factories.

এই গবেষণা প্রতিবেদনগুলোতে রেশম শিল্পের নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে রেশম শিল্পের যে সমস্যা ও সম্ভাবনা তা তুলে ধরা হয়নি।

উপরোক্ত গবেষণা প্রতিবেদন ছাড়াও রেশম শিল্পের উপরে কিছু বই, পুস্তক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, রেশম শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিবেদন ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ গবেষণা প্রতিবেদন কাঠামো ঃ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সবিস্তারে বিষয়টি আলোচনা করা অত্যন্ত কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তবুও আমি আমার সীমিত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে যতদূর সম্ভব বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় অনেকগুলি শব্দ-সংক্ষেপ (ABBREVIATIONS) ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির পূর্ণরূপ শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের কিছু স্থানীয় ও নিজস্ব পরিভাষা (GLOSSARY) রয়েছে। এ সমস্ত স্থানীয় ও নিজস্ব পরিভাষা সম্পর্কে জানা না থাকলে বিষয়টিকে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এজন্য শুরুতে রেশম বিষয় সম্পর্কীয় স্থানীয় ও নিজস্ব পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও পাঠকদের সুবিধার্থে শুরুতে মূল আলোচনায় যে সমস্ত তথ্য, উপাত্ত ও চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে পৃষ্ঠা নম্বর সহ সেগুলির একটি তথ্য সারণী দেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণা প্রতিবেদনকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, রেশমের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস, বর্তমানে আমাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেশম পরিস্থিতি, গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু তত্ত্বগত ধারণা যেমন-অর্থনীতি সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, শিল্প সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত বাংলাদেশের কিছু সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা সীমাবদ্ধতা, রেশম শিল্প সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা কর্ম ও বই পুস্তকের পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রেশম শিল্প সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের কি কি সমস্যা ও সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে অ-তুঁত রেশম চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে সুপারিশমালা ও উপসংহার দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে পরিশিষ্ট এবং গ্রন্থপঞ্জী দেয়া হয়েছে। পরিশিষ্টের মধ্যে রেশম শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো দেয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য সারণী, আলোকচিত্র ও মানচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে এ গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীতে যে সমস্ত বই-পুস্তক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক, অর্ধ-বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যানের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলো এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনার একটা তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা লব্ধ ফলাফলের আলোকে রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা লব্ধ ফলাফলের আলোকে রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা।

৪.১ রেশম শিল্প সম্পর্কীয় কতিপয় প্রাথমিক ধারণা ঃ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে হলে রেশম চাষ সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। "সেরিকালচার" শব্দের আভিধানিক অর্থ -"Culture of Sericine" বা সেরিসিন নামক এক ধরনের প্রোটিন এর লালন । সেরিসিন হলো রেশমের মূল গাঠনিক পদার্থ। অর্থাৎ যে জীব সেরিসিন প্রস্তুত করে তার লালনই হচ্ছে সেরিকালচার যা বাংলায় রেশম চাষ। রেশম কীটই বর্তমান বিশ্বে ৯৫% ব্যবহারযোগ্য রেশম তৈরী করে থাকে । রেশম চাষের মূল কার্যক্রম তিনটি ঃ-

(১) তুঁত পাতা উৎপাদন যা খেয়ে রেশম কীট বেঁচে থাকে।

(২) রেশম পোকা (পলু) পালন, যে কীট রেশম গুটি তৈরী করে।

(৩) রিলিং এর মাধ্যমে রেশম সূতা আহরণ।[১]

উপরোক্ত কার্যক্রমের মধ্যে একটি কর্মকান্ডের সাথে আর একটি কর্মকান্ডের কোন মিল না থাকলেও সম্পর্কের দিক দিয়ে একটি আর একটির উপর সর্ম্পূণ নির্ভরশীল। যেমন অধিক তুঁত পাতা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে অধিক রেশমগুটি উৎপাদন এবং অধিক সূতা উৎপাদন নির্ভর করে অধিক রেশমগুটি উৎপাদনের উপর।

রেমশ সূতার মানোন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন রেশম গুটির প্রয়োজন। তেমনি মান সম্পন্ন রেশমগুটির জন্য মানসম্পন্ন তুঁত পাতা প্রয়োজন। কাজেই শুধুমাত্র তুঁতচাষ কিংবা গুটি উৎপাদন কিংবা রেশম উৎপাদন কর্মকান্ড পৃথকভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এই তিনটি অংশের যে কোন একটি অংশ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা সরাসরি অন্য অংশগুলোকেও প্রভাবিত করে।

এখন রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে উপরোক্ত তিনটি কার্যক্রম ছাড়াও রেশম বস্ত্র উৎপাদন ও রেশম বস্ত্র বাজারজাতকরণ সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। সুতরাং রেশম শিল্পের ধাপগুলোকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলো হল ঃ-

(১) তুঁত চাষ,

(২) পলু পালন ও রেশমগুটি উৎপাদন,

(৩) রেশম সুতা রিলিং ও স্পিনিং,

(৪) রেশম বস্ত্র উৎপাদন,

---

১. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

(৫) রেশম বস্ত্র বাজারজাতকরণ।

উপরোক্ত পাঁচটি ধাপের প্রত্যেকটির সমস্যা ও সম্ভাবনা কি সেগুলোর তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মূলতঃ বাংলাদেশের রেশম শিল্পের কি কি সমস্যা এবং কি কি সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং রেশম শিল্পের প্রত্যেকটি ধাপের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল ।

৪. ২ তুঁত চাষ সম্মন্ধীয় তথ্য বিশ্লেষণঃ

রেশম শিল্পের কাঁচামাল রেশমগুটি। রেশম সূতা আহরণ এবং ঐ সুতা ব্যবহারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান রেশম বস্ত্র উৎপাদনই এই শিল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কাঁচামাল রেশমগুটি উৎপাদনের জন্যই রেশম চাষ। এই চাষের আবার দুটি পর্যায় আছে (১) মাঠে তুঁত গাছের চাষ,(২) ঘরে রেশম কীট পালন। তুঁত গাছের চাষ, রেশম কীট পালন এবং এর উপর গড়ে ওঠা রেশম শিল্পে গ্রামের স্বল্প আয়ের গরীব কৃষকেরা নাম মাত্র পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন । কৃষি ভিত্তিক এই শিল্পের উন্নয়ন করে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তাই রেশম চাষের উন্নয়ন অপরিহার্য। আর এই রেশম চাষের প্রথম পর্যায় হল মাঠে তুঁত গাছের চাষ।

তুঁত চাষের তথা রেশম চাষের পক্ষে বিবেচ্য সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) যে কোন ফসলের চেয়ে বেশী লাভবান হওয়া যায়।

২) বৎসরে অন্তত: চারবার ফসল তোলা যায় যা অন্য কোন ফসল থেকে পাওয়া যায় না।

৩) অধিক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব।

৪) বাড়ির ৫ বছরের ছেলেমেয়ে থেকে বৃদ্ধলোক পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পায় এবং পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়।

৫) অন্য ফসলের জমিতে তুঁত চাষ না করেও বাড়ির আনাচে, কানাচে, উচু জমির আইলে ও পুকুর পাড়ে তুঁতগাছ লাগানো সম্ভব।

৬) গ্রাম এলাকায় অল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে রেশম সুতা ও রেশম কাপড় উৎপাদনের কুটির শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

৭) কৃষি ভিত্তিক এই শিল্পের মাধ্যমে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

৮) এই শিল্পের সবগুলি পর্যায়েই গ্রামের মেয়েদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তুঁত চাষের ইংরেজী নাম মালবেরী। বৈজ্ঞানিক নাম Morus (SP.M. albo,M. Indica M.Serrata, M. Lavigata etc)২। তুঁতগাছ বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। এ গাছ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই জন্মায়। নাতিশীতোষ্ণ হতে গ্রীষ্ম মন্ডলীয় আবহাওয়ায় এ গাছের চাষ ভালভাবে করা যায়। একবার তুঁতগাছের চাষ করলে এ থেকে ২০-২৫ বছর পাতা সংগ্রহ করা যায়।

তুঁতের বংশ বৃদ্ধি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, (১) তুঁতের ডাল থেকে (২) তুঁতের বীজ থেকে। দেশী ভাষায় ঝুপি তুঁত থেকে ডাল কাটাকে মূড়া কাটা আর তুঁত গাছ থেকে ডাল কাটাকে গাছ ছাটাই বলে। এই ডাল হতেই তুঁতের বংশ বৃদ্ধি করা হয়। ৩-৪ টি চোখ সহ ডাল ছোট ছোট করে কেটে কাটিংস বা তুঁতকাঠি তৈরী করতে হয়। ডাল ৬-৯ মাস বয়সের হওয়া দরকার। সবুজ নরম ডাল লাগালে গাছ হবে না। উপযুক্ত বয়সের পোক্ত ডাল সরাসরি ঝুপি তুঁত চাষে ব্যবহার করা যায় বলে ঝাড় তুঁত বা গাছ তুঁতের চারা উৎপাদনের জন্যও ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে মূলত: কাটিংস ও চারা দ্বারাই তুঁত চাষ করা হয়।[৩]

আমাদের দেশে যে প্রজাতির রেশম চাষ করা হয় তার প্রধান খাদ্য হচ্ছে তুঁত পাতা। এজন্য আমাদের দেখা উচিত আমাদের দেশে তুঁত চাষের কি কি সমস্যা এবং সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আমি রাজশাহীর মীরগঞ্জ অঞ্চল এবং নবাবগঞ্জের ভোলাহাটের তুঁত চাষীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করি। নিম্নে তুঁতচাষ সম্পর্কিত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হলো।

তুঁত চাষীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, মাটি, জলবায়ু তুঁতচাষ এবং রেশম চাষের জন্য বেশ উপযোগী। আমাদের দেশে বছরের প্রায় সব সময় রেশম চাষ করা যায়। রেশম শিল্প বাংলাদেশের প্রচীন কুটির শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ অর্থনীতিতে-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। রেশম চাষীগণ যুগ যুগ ধরে তুঁত চাষ ও রেশম কীট পালন করে আসছে কিন্তু-এর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ও উদাসীন। রেশম উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশ নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে রেশম শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি সাধন করছে। কিন্তু আমাদের দেশের রেশম চাষীগণ এখনও সেই মান্ধাতা আমলের তুঁতচাষ ও রেশম প্রজাতি ব্যবহার করছে। ফলে রেশম উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব। উন্নত প্রযুক্তি জানতে হলে আমাদের চাষীদের শিক্ষার প্রয়োজন ।

---

২. বাংলাদেশের ঐতিহ্য : রাজশাহী সিল্ক, মোঃ আবদুর রশীদ খান, উত্তরা সাহিত্য মসজলিশ, মনিবাজার, রাজশাহী,১৯৯৮, পৃষ্ঠা. ৮৬

৩. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃষ্ঠা. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের তুঁত চাষীদের ৭০% ভাগ এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী থেকে এর নীচে। এবং বাকী ৩০% ভাগ এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে এস, এস, সির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই আমরা বলতে পারি আমাদের দেশের তুঁত চাষীদের একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার অভাব।সারণী-১ (১)

তুঁত চাষীদের পেশা ঃ

মীরগঞ্জ ও ভোলাহাট অঞ্চলের রেশম ও তুঁত চাষীরা বংশ পরম্পরায় এই রেশম ও তুঁত চাষ করে আসছে। বর্তমানে এই পেশা অলাভজনক হওয়ার জন্য অনেকেই আস্তে আস্তে এই পেশা থেকে সরে আসছে। তবুও আমরা এই গবেষণায় দেখতে পাই এখনও তুঁত চাষ ও রেশম চাষ ৫০% ভাগ চাষীর মূল পেশা এবং ৫০% ভাগ চাষীর সহকারী পেশা। কাজেই আমরা বুঝতে পারি এখনও অনেকেরই এই কাজের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা আরও ভালভাবে এই কাজ করতে পারবে। সারণী -১ (২)

তুঁত চাষে পারিবারিক সহযোগিতা ঃ

রেশম শিল্পের সুবিধা হল এটা একদিকে কৃষি ভিত্তিক এবং অন্যদিকে শ্রম ভিত্তিক। দেশের অব্যবহৃত বৃহৎ শ্রমজীবি অংশকে সহজভাবে কাজে লাগানোর এত বড় সুযোগ অন্য কিছুতেই নেই। রেশম শিল্প সহজ শ্রমসাধ্যের কাজ। পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এ কাজ করতে পারে। বিশেষ করে মহিলাদের কাজে লাগানোর এটা সর্বোত্তম পেশা। যেহেতু এতে বিনিয়োগের পরিমান অতি সামান্য এবং নিজেরাই সবকিছু করতে পারে সেজন্য লাভের পরিমান খুব বেশী। আবার অব্যবহৃত তুঁত গাছ ভাল জ্বালানী হিসেবে পরিবারের একটা বিরাট সমস্যার সমাধান করে।

বাংলাদেশের ৮০% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পঁচাত্তর ভাগই কৃষি শ্রমিক। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রামীণ জনগণের মধ্যেই অধিকতর । এতে প্রতি বছর চাষযোগ্য জমির পরিমান যেমন কমছে তেমনি হ্রাসকৃত জমিতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে পড়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি পেলেও অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ও আয় তেমন বাড়েনি। এ অবস্থায় রেশম শিল্পের বিভিন্ন স্তরের কাজ নিজের পছন্দ ও উপযোগীতা অনুযায়ী গ্রহণ করানো গেলে অতি সহজে গ্রামীণ জনগণের বেকারত্ব মোচন ও উপার্জন বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ থেকে দেখা যায় তুঁত চাষের ক্ষেত্রে ৫০% ভাগ পরিবারের সদস্যরাই এই কাজ করে থাকে এবং ৫০% ভাগ ক্ষেত্রে পরিবার এবং পরিবার বহির্ভূত শ্রমিকের দ্বারা কাজ করা হয়। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি পরিবারের সদস্যরাও এই কাজ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশের মহিলাদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। (সারণী -১ (৩))

তুঁতচাষে ব্যবহৃত জমির মালিকানা ঃ

যে কোন ফসল চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিকানাও একটা বিরাট ব্যাপার। কারণ নিজের জমিতে মানুষ যতটা আগ্রহ নিয়ে কাজ করে অন্যের জমিতে মানুষ ততটা আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে চায়না। আমাদের জরিপকৃত অঞ্চলের চাষীদের ৭০% ভাগ নিজস্ব জমিতে তুঁত চাষ করে থাকে এবং বাকী ৩০% ভাগ চাষী অন্যের জমি বর্গা হিসাবে নিয়ে চাষ করে থাকে। সুতরাং বেশীর ভাগ চাষীই আগ্রহের সাথে এই কাজ করে থাকে। (সারণী- ১ (৪))

তুঁত চাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষন

তুঁত চাষ রেশম শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়। তুঁত পাতাই রেশম পোকার একমাত্র খাদ্য। রেশম পোকার শরীরের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রেশম গ্রন্থির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ তুঁত পাতা থেকেই পেয়ে থাকে কাজেই তুঁত পাতার উৎপাদন ও পুষ্টিমানের উপর রেশম গুটির গুনগতমান সরাসরি নির্ভরশীল। অন্যদিকে তুঁতপাতা উৎপাদনের উপরই একজন রেশম চাষী কি পরিমান রেশমগুটি উৎপাদনে সক্ষম তা নির্ভর করে। সেজন্য তুঁতপাতা উৎপাদনের সঙ্গে রেশমগুটির উৎপাদন সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই পরিমিত পরিমান ও গুনগত মানের তুঁতপাতা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির তুঁত চাষ । আর এ জন্য উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত চাষাবাদ,পরিচর্যা এবং মানসম্পন্ন পাতা উৎপাদন বিষয়ে তুঁতচাষীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

এই জরিপ অনুযায়ী মীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলে যে সমস্ত চাষী রয়েছে তাদের মধ্যে ৭০% ভাগই প্রশিক্ষণ ছাড়া এই তুঁত চাষের কাজ করে যাচ্ছে । এবং ৩০% ভাগ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। কাজেই উন্নত মানের পর্যাপ্ত তুঁত পাতা উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ দরকার এবং তার জন্য যে ব্যবহারিক প্রশিক্ষন দরকার তা আমাদের কৃষকদের নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে আমরা ভাল ফল আশা করতে পারিনা। সারণী -১ (৫)

Dhaka University Institutional Repository

তুঁত চাষে মূলধনঃ

আমরা জানি যে কোন উৎপাদনমূলক কাজের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। তুঁত চাষের জন্য খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের দরিদ্র কৃষকদের এই মূলধনটুকু সরবরাহ করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তুঁত চাষ করতে গেলে সাধারণত আমরা দেখি কিছু স্থায়ী মূলধন এবং কিছু চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। তুঁত চাষের ক্ষেত্রে জমি ক্রয়, কিছু যন্ত্রাংশ ক্রয় ইত্যাদির জন্য একটা মোটা অংকের স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন হয় এবং তুঁত চারা ক্রয়,সার, কীটনাশক ঔষধ, সেচ, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদির জন্য কিছু চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়।

এই জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় তুঁত চাষের ক্ষেত্রে ২০% ভাগ চাষী নিজস্ব তহবিল থেকে এই মূলধন সরববরাহ করে থাকে, ২০% ভাগ চাষী নিজস্ব তহবিল ও রেশম বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ চালায়, ২০% চাষী নিজস্ব তহবিল এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে মূলধন সরবরাহ করে এবং ৪০% চাষী নিজস্ব তহবিল ছাড়া দেশীয় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। কাজেই আমরা বলতে পারি আমাদের তুঁত চাষীদের মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং মূলধন সংগ্রহে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সারণী -১ (৬))

তুঁত চাষ পদ্ধতি ঃ

দোঁয়াশ এবং লাল মাটিতে যে স্থানে জমিতে প্রচুর জৈব সার এবং মাটি সামান্য এসিডযুক্ত অর্থাৎ পি এইচ ৬.২ হতে ৬.৮ এর মধ্যে এবং বছরে ৬০০ হতে ২৫০০ মি: মি: বৃষ্টি হয় সে স্থানে তুঁত গাছের চাষ করা যায়। অতিরিক্ত ক্ষার ও লবনযুক্ত মাটিতে এ গাছের বৃদ্ধিহ্রাস পায় । বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা সমূহের কিছু অংশের মাটিতে এসিডের পরিমান বেশী থাকার অর্থাৎ উক্ত এলাকাসমূহের যে সকল স্থানে পি এইচ -৬ এর নীচে সে স্থান ছাড়া এবং সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের অত্যধিক লবনাক্ত এলাকা ছাড়া সব বন্যামুক্ত এলাকায় রেশম চাষ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব।

আমাদের দেশে মোট তিন উপায়ে তুঁত চাষ করা হয়। যথা ঝুপি পদ্ধতি, ঝাড় পদ্ধতি এবং গাছ পদ্ধতি। এর মধ্যে ঝুপি ও গাছ পদ্ধতিই মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় (ঝাড় পদ্ধতি মূলত রেশম বোর্ডের নিজস্ব নার্সারীতে সীমাবদ্ধ) । এ দুটো পদ্ধতিরই নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেক আপেক্ষিক সুবিধা -অসুবিধা রয়েছে। তবে ঝুপি পদ্ধতিতে চাষ করলে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যেই পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু গাছ পদ্ধতিক্ষেত্রে প্রথম পাতা সংগ্রহ করতে সময় লাগে প্রায় ৩ বছর। গাছ পদ্ধতির আপেক্ষিক সুবিধা হল এগুলো ফসলী জমি নষ্ট না করে রাস্তার ধারে, নদীর ও পুকুর পাড়ে, বাড়ীর আঙ্গিনায় এমনকি ফসলী জমির আইলেও লাগান যায়। নিম্নে ঝুপি তুঁত চাষ পদ্ধতি এবং গাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

ঝুপি তুঁত চাষ পদ্ধতি

ঝুপি তুঁত চাষে সাধারণত ৬"–৯" তুঁত কাঠি দ্বারা তুঁত চাষ করা হয়ে থাকে। ঝুপি পদ্ধতিতে চাষ করার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে নির্বাচিত জমি ৩/৪ বার উত্তমরূপে চাষ করে ঢিলা ভেংগে আগাছা বেছে জমির মাটিকে ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ৩০- ৪০ মন জৈব সার এবং ২৮ কেজি ইউরিয়া,১৪ কেজি পটাশ সার প্রায়োগ করে জমির মাটির সংগে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

তুঁত গাছ রোপন পদ্ধতি

তুঁত গাছ জন্মানোর জন্য প্রথমত তুঁত চারা তৈরী করতে হবে এবং এজন্য কমপক্ষে এক বৎসর বয়সের ২২৫-২৫০ সে: মি: লম্বা সতেজ এবং সোজা চারা বাছাই করে রোপন করতে হয়। চারা গাছ রোপনের জন্য একসারি হতে আর এক সারির দূরত্ব ২-৩ মি: এবং একগাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব ১.৮ মি: হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি চারার গর্তে ৩-৫ কেজি জৈব সার গর্তের মাটিতে মিশিয়ে নিতে হবে। চারা রোপনের পূর্বে প্রতিটি গর্তে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করে তার উপরে হালকা মাটির স্তর দিয়ে দড়ি ধরে সোজা করে চারা গাছ রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রেখে মাটি চাপা দিতে হবে। কাজ শেষ হলে ১.৮-২.০ মি: উচ্চতায় প্রতিটি চারার মাথা কেটে নিতে হবে।[৪] এই গবেষণায় আমরা দেখি মীরগঞ্জ ও তোলাহাট অঞ্চলের তুঁত চাষীদের মধ্যে ৮০% ভাগ চাষী ঝুপি পদ্ধতির মাধ্যমে তুঁত চাষ করে থাকে এবং ২০% ভাগ চাষী গাছ পদ্ধতির মাধ্যমে তুঁত চাষ করে থাকে। সারণী-১ (৭)

আমাদের দেশে তুঁত গাছের ৩২ টি জাত রয়েছে। সব জাতের ফলন সমান নয়

---

৪. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় জাত যেখানে বিঘা প্রতি ৬০ থেকে ৭০ মন পাতা দেয়। বাংলাদেশ রেশম গবেষণাগারের উন্নত জাত (বি,এস,আর, এম-৫;বি, এস, আর, এম-১৮; বি,এস আর এম-১৯) থেকে সেখানে ১০০ মনের ও বেশী পাতার ফলন পাওয়া যায়।এই গবেষণায় দেখা যায় মীরগঞ্জ ও তোলাহাট অঞ্চলের ৭০% ভাগ চাষীই উন্নত জাতের তুঁত চারা ব্যবহার করে থাকেন। বাকী ৩০% ভাগ চাষী দেশী জাতের চারা ব্যবহার করে থাকে। কাজেই তুঁত চারা রোপনের ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়না। (সারনী -১ (৮))

তুঁত ক্ষেতের পরিচর্যা ঃ

তুঁত ক্ষেতের পরিচর্যা বলতে মোটামুটিভাবে গাছকে সময়মত ছাটাই করা, সুষম সার প্রয়োগ করা, খরার সময় পানি সেচ দেয়া এবং জমির মাটি বার বার কুপিয়ে আলগা করে ঘাস আগাছা পরিকার করাকে বুঝায়। ভাল ও বেশি পাতা ফলানোর জন্য তুঁত জমিতে খরার মৌসুমে পানি সেচের প্রয়োজন। আমার গবেষণায় আমি দেখতে পাই আমাদের কৃষকদের ৭০% ভাগ কৃষকের পানি সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। মাত্র ৩০% ভাগ চাষীর পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। সারণী-১ (৯)

তুঁত জমিতে বিঘা প্রতি ৭৬ কেজি (২ মন) ইউরিয়া,নাইট্রোজেন ৩৮ কেজি (১ মন), টি,এস,পি (ফসফেট) ২৮ কেজি (৩০ সের),এম,পি (পটাশ) এবং ২ থেকে ২.৫ টন (৫৫ থেকে ৭০ মন) গোবর বা পাতা পচা সার প্রয়োগ করা উচিত। এই জরিপে দেখতে পাই ৫০% ভাগ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয় কিন্তু বাকী ৫০% ভাগ ক্ষেত্রেই জমিতে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করা হয় না। সারণী- ১ (১০))

তুঁত গাছের ক্ষতিকারক রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমন ঃ

বাংলাদেশে তুঁত গাছে ব্যাকটেরিয়াজনিত ছত্রাক, ভাইরাস, নেমোটোড জনিত বেশ কয়েক প্রকার রোগ হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের তেমন ক্ষতি লক্ষ্য করা না গেলেও ছত্রাক, ভাইরাস ও নেমোটোড জনিত রোগে অনেক সময় তুঁতগাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রধান ক্ষতিকারক রোগগুলি হলঃ পাউডারী মিলউড, লিফস্পট রোগ, তুঁত চারার পচন, তুঁত চারার শিকড় পচন, টুকরা রোগ, তুঁত গাছের কৃমি রোগ ইত্যাদি। তুঁতগাছে বেশ কিছু ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গের আক্রমন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ (১) কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, (২) লিফ হপার, (৩) বিছা পোকা, (৪) উই পোকা এবং (৫) সবুজ ঘাস ফড়িং। এই সমস্ত পোকামাকড়ের আক্রমনের ফলেও তুঁত গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তুঁতগাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে জমিতে কিছু ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় এবং পোকা মাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হলে কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। মীরগঞ্জ ও

Dhaka University Institutional Repository

ভোলাহাট অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে ৫০% ভাগ এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু ৫০% ভাগ চাষীই কোন ঔষধ প্রয়োগ করেনা। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা তুঁত চাষের ভাল ফলন আশা করতে পারিনা। (সারনী-১ (১১))

তুঁত চাষের অর্থনৈতিক দিকঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ বেকার শ্রম শক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমপৃক্ত করতে রেশম শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ কৃষিকর্মের মধ্যে তুঁত গাছের চাষ ও গুটি পোকার চাষ শ্রম নির্ভর আমাদের দেশের অন্যান্য কৃষিকর্মে এত শ্রমের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারা বছর গুটি পোকার চাষ করা যেতে পারে। আর এ গুটি পোকার চাষ তুঁত গাছের পাতা উৎপাদনের উপরই নির্ভরশীল। তাই প্রতি ইউনিট জমি হতে যত বেশী পাতা উৎপাদন করা সম্ভব তত বেশী পলুপালন করে রেশমগুটির উৎপাদন বাড়ানোও সম্ভব। সুষম সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, আগাছা দমন, কীট পতঙ্গের আক্রমন দমন, আর সে সঙ্গে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে তুঁত পাতার উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ভূমিহীন চাষী কর্তৃক ২০০ হতে ২৫০ টি তুঁত গাছের পাতা বিক্রয়ের অর্থনৈতিক দিক

আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষকরা ভূমিহীন তারা রাস্তার দু'ধারে, বাড়ীর আনাচে-কানাচে, গোরস্থানে এবং খাস পুকুর পাড়ে ২০০ হতে ২৫০ টি তুঁত গাছ লাগিয়ে নিজে শারীরিক পরিশ্রম করে প্রায় ১ বিঘা তুঁত জমির আয়ের সমপরিমান অর্থ উপার্জন করতে পারে। নীচে ২৫০ টি তুঁত গাছের অর্থকরী দিক দেখানো হল ঃ

প্রথম বছরের খরচ

খরচের বিবরণঃ

১।	২৫০ টি তুঁত চারার মূল্য (পরিবহন খরচ সহ)	১০০.০০
২।	২৫০ টি তুঁত চারা রোপনের জন্য ২৫০ টি গর্ত করার জন্য ৫ জন শ্রমিকের মজুরী ৩০.০০ টাকা হারে	১৫০.০০
৩।	সার প্রয়োগ:	
	গোবর সার ১২৫০ কেজি	২৫০.০০
	ইউরিয়া সার ৫০ কেজি	২৫০.০০
	পটাশ ২৫ কেজি	১০০.০০
৪।	গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৫০টি খুঁটি	২৫০.০০
৫।	একবার গোড়া খোড় দেওয়ার জন্য ৪ জন শ্রমিকের মজুরী ৩০.০০ টাকা হারে	১২০.০০
	মোট =	১২২০.০০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বছরের খরচ

১।	মৃত গাছের স্থলে জীবিত গাছ লাগান (প্রয়োজন হলে) ৫০ টি	৫০.০০
২।	সার প্রয়োগ:	
	জৈব সার ১২৫০ কেজি	২৫০.০০
	ইউরিয়া ১৫ কেজি	১২৫.০০
	ফসফেট ১২.৫ কেজি	৬২.৫০
	পটাশ ৯ কেজি	৩৬.০০
৩।	সার প্রয়োগ ও গাছের পরিচর্যা ২ বারে	
	৮ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	২৪০.০০
	মোট =	৭৬৩.৫০/-

তৃতীয় বছরের খরচ ঃ

১।	সার প্রয়োগ:	
	জৈব সার ১২৫০ কেজি	২৫০.০০
	ইউরিয়া ১৫ কেজি	১২৫.০০
	ফসফেট ১২.৫ কেজি	৬২.৫০
	পটাশ ৯ কেজি	৩৬.০০
২।	সার প্রয়োগ ও গাছের পরিচর্যা ২ বারে	
	৮ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	২৪০.০০
	মোট =	৭১৩.৫০/-

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের মোট খরচ টাকা ১২২০.০০ + ৭৬৩.৫০ + ৭১৩.৫০ =২৬৯৭.০০ টাকা। গাছ পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করলে প্রথম বছরে পলু পালন করার জন্য কোন তুঁত পাতা আহরণ করা যাবেনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে আংশিক পাতা, পাওয়া যাবে। তৃতীয় বছরের পর হতে গাছে পরিপূর্ণ পাতা উৎপন্ন হবে। একই গাছ থেকে কমপক্ষে ২৫-৩০ বছর পূর্ণ মাত্রায় পাতা পাওয়া যাবে। এ ২৫-৩০ বছর আর কোন প্রাথমিক খরচ পড়বেনা। সুতরাং প্রতি বছরের জন্য প্রথমিক খরচের অংশ দাড়াবে ২৬৯৭.০০ ÷ ২৫=১০৭.৮৮ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০৮.০০ টাকা। পরবর্তী বছর গুলোতে শুধু পাতা উৎপাদনের জন্য চাষাবাদ খরচ লাগবে।

Dhaka University Institutional Repository

বছরে ২৫০ টি গাছের চাষাবাদ খরচ

১।	প্রথমিক খরচের প্রতি বছরের অংশ	১০৮.০০
২।	সার প্রয়োগ:	
	গোবর সার বা জৈবসার ২০০০ কেজি	৪০০.০০
	ইউরিয়া ৪০ কেজি	২০০.০০
	ফসফেট ২০ কেজি	১০০.০০
	পটাশ ১৫ কেজি	৬০.০০
৩।	সার প্রয়োগ (জৈব সার ১/২ বার এবং রাসায়নিক সার ৪ বার)	
	ও গাছের পরিচর্যা ৪ বারে মোট ২৮ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	৮৪০.০০
৪।	প্রুনিং করা (১৫ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে)	৪৫০.০০
		মোট = ২১৫৮.০০

২৫০ টি গাছ থেকে বছরে পাতা উৎপাদিত হবে প্রায় ৪০০০ কেজি (প্রতিটি গাছে বছরে ১৬ কেজি হিসাবে) উপরে বর্নিত খরচের ভিত্তিতে প্রতি কেজি তুঁত পাতার উৎপাদন খরচ পড়বে প্রায় ০. ৫৪ টাকা। প্রতিকেজি তুঁতপাতা ১.২৫ টাকা হিসাবে বিক্রি করলে মোট আয় হবে ৫০০০/০০ (পাঁচ হাজার টাকা) সুতরাং ২৫০ টি তুঁত গাছের চাষ করলে শুধু তুঁত পাতা বিক্রি করে নীট মুনাফা হবে (পাতা বিক্রি হতে প্রতি বছরে মোট আয় ৫০০০/০০ –পাতার উৎপাদন বাবদ খরচ ২১৫৮/০০) ২৮৪২/ টাকা।

গাছ রোপন ও পরিচর্যা কাজ বাড়ীর বেকার লোকজন দ্বারা অথবা অন্যান্য কাজের অবসরে করলে উৎপাদন খরচও কমে যাবে সে ক্ষেত্রে ২৫০ টি গাছ থেকে বছরে মুনাফা হবে ৪০০০/= (চারহাজার) টাকার ও বেশী।

মধ্যবিত্ত চাষী কর্তৃক ১ বিঘা ঝুপি তুঁত চাষের অর্থনৈতিক দিকঃ

একজন ভুমিহীন কৃষক যেমন বাড়ীর আনাচে কানাচে, রাস্তার ধারে তুঁত গাছ লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন সেরূপ মধ্যবিত্ত চাষী তাদের জমিতে তুঁত চাষ করে অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশী আয় করতে পারেন। নিম্নে মধ্যবিত্ত চাষীদের জন্য ১ বিঘা জমিতে ঝুপি তুঁত চাষের আয় -ব্যায় দেখান হল:-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বছরে চাষাবাদ খরচ ঃ

খরচের বিবরণ		টাকা
(১)	হাল চাষ ও জমি প্রস্তুত করণ-	
	৬ জোড়া হাল ৫০/-টাকা হারে এবং	
	২ জন শ্রমিক ৩০/-টাকা হারে	৩৬০.০০
(২)	সার প্রয়োগ :	
	জৈব সার ১৫০০ কেজি	৩০০.০০
	ইউরিয়া ২৮ কেজি	১৪০.০০
	পটাশ ১৪ কেজি	৫৬.০০
(৩)	২০ মন তুঁত কাটিংসের মুল্য	৭০০.০০
(৪)	তুঁত কাঠি প্রস্তুত ও রোপন ২০ জন শ্রমিক -	
	প্রতি শ্রমিক ৩০/= টাকা হারে	৬০০.০০
(৫)	হালকা খোড় ও নিরানী ২ বার মোট ১৪ জন শ্রমিক ৩০/= টাকা হারে	৪২০.০০
(৬)	অন্যান্য খরচ	২৫০.০০
	মোট খরচ =	২৮২৬.০০

তুঁত কাটিংস রোপনের পর একই জমি থেকে অন্তত ২০ বছর ধরে পাতা উৎপাদন করা যায় । পরবর্তী বছরগুলোতে চাষাবাদের জন্য এরূপ প্রাথমিক খরচ পড়বেনা । একই জমিতে মোট চাষাবাদের সময় কাল ২০ বছর ধরলে প্রাথমিক খরচের প্রতি বছরের অংশ হবে ২৮২৬ ÷ ২০ =১৪১.৩০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪২.০০ টাকা । পরবর্তী বছরগুলোতে শুধু খোড়, নিড়ানী, সার, সেচ ইত্যাদি চাষাবাদের জন্য খরচ হবে। এ পদ্ধতিতে রোপনের ৬ মাস পর পলুপালনের উপযোগী তুঁত পাতা পাওয়া যাবে বলে প্রথম বছরে পাতার উৎপাদন কম হলেও পরবর্তী বছর হতে পুরোপুরি পাতা পাওয়া যাবে ।

দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি বছরের চাষাবাদ খরচ

১)	প্রাথমিক খরচের প্রতি বছরের অংশ -	১৪২.০০
২)	৬ বার খোড়ও নিড়ানী প্রতি বার ৭ জন শ্রমিক-	
	হিসাবে প্রতি জন ৩০/= টাকা হারে -	১২৬০.০০
৩)	সার প্রয়োগ :	
	গোবর সার ঃ ২০০০কেজি-	৪০০.০০
	ইউরিয়া সার ঃ ৪০ কেজি-	২০০.০০
	ফসফেট সার ঃ ২০ কেজি -	১০০.০০
	পটাশ ১৫ কেজি -	৬০.০০
৪)	সেচ প্রদান : (প্রয়োজন বোধে) -	৩০০.০০
	মোট পাতা উৎপাদন খরচঃ	২৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

এক বিঘা জমি হতে বছরে মোট তুঁত পাতা উৎপাদিত হবে প্রায় ৪০০০ কেজি। চাষাবাদের জন্য উপরে বর্ণিত খরচের ভিত্তিতে প্রতি কেজি তুঁতপাতার উৎপাদন খরচ পড়বে ০.৬২ টাকা। প্রতি কেজি তুঁত পাতার বিক্রয় মূল্য ১.২৫ টাকা হিসাবে মোট আয় হবে ৫০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বিঘায় শুধু পাতা উৎপাদন করেই নীট মুনাফা করা যাবে ৫০০০.০০ - ২৪৬২.০০ = ২৫৩৮.০০ টাকা। জমির পরিচর্যা ও অন্যান্য কাজ বাড়ীর বেকার সদস্যদের দ্বারা অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে করতে পারলে মোট মুনাফা বেড়ে ৪০০০.০০ টাকারও অধিক হবে। তাছাড়া ১ বিঘা জমি অথবা ২৫০ টি তুঁত গাছ থেকে বছরে প্রায় ২৫/৩০ মন খড়ি পাওয়া যাবে যার বাজার মূল্য প্রায় সাতশত/ আটশত টাকার কম নয়।[৫]

সঠিকভাবে তুঁত চাষ করলে ১ বিঘা জমি অথবা ২৫০টি তুঁত গাছ থেকে বছরে ১০০ মন তুঁত পাতা উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু এই গবেষণায় আমি দেখি সঠিকভাবে তুঁত চাষ করা হয় না। আমাদের চাষীদের ৫০% জনের মতে বছরে ৫০ মণের নীচে তুঁত পাতা উৎপাদন করে। বাকী ৫০% জনের মতে ৫০-১০০ মণের মধ্যে উপরে তুঁত পাতা উৎপাদন করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সঠিকভাবে চাষের অভাবে আমাদের তুঁত চাষীরা আশানুরূপ তুঁতপাতা উৎপাদন করতে পারে না। (সারনী -১ (১২))

তুঁত পাতার বাজারজাতকরণ ঃ

মীরগঞ্জ ও ভোলাহাট তুঁত চাষীদের অনেকেই দেখা যায় পলুপালনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। ফলে তারা যে তুঁত পাতা উৎপাদিত হয় তা পলু পালনের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এই গবেষণায় আমি দেখি এই দুই অঞ্চলের ৮০% ভাগ তুঁত চাষীই পলু পালনের সাথে জড়িত এবং তারা উৎপাদিত পাতা নিজেদের পলু পালনের কাজে ব্যবহার করেন এবং বাকী ২০% ভাগ চাষী অন্য পলু পালন কারীদের কাছে বিক্রয় করেন। কাজেই দেখা যায় যারা একসাথে তুঁত চাষ ও পলুপালন করছেন তারা নিজেরাই এই পাতা ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে পাতা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হয় না। সারণী-১ (১৩))

আমরা জানি তুঁত পাতার উৎপাদন পলুপালনের সাথে জড়িত। পলুপালন যত বাড়বে তুঁত পাতার চাহিদাও তত বাড়বে এবং যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হবে। কিন্তু আমরা দেখছি তুঁত পাতার চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । এই গবেষণায় আমি দেখছি ১০০% তুঁত চাষীর মতেই তুঁত পাতার চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সারণী-১ (১৪)

---

৫. বাংলাদেশে রেশম বোর্ড, আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প ১৯৯২ পৃষ্ঠা: ৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তুঁত পাতার চাহিদা কমে যাওয়ার কারণঃ

তুঁত চাষীদের১০০% ভাগের মতে তুঁতপাতার এই চাহিদা কমে যাওয়ার পিছনে কতগুলো কারণ কাজ করছে। তুঁত চাষীদের ৭৫% জনের মতে পলুপালনের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে তুঁত পাতার চাহিদাও কমে যাচ্ছে। বাকী ২৫% জনের মতে বিদেশী সুতা আমদানীর ফলে আমাদের দেশী সুতার চাহিদা কমে যাচ্ছে। যার প্রভাবে পলুপালনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং তুঁত পাতার চাহিদাও কমে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি দেশী সুতার চাহিদার অভাব পরোক্ষভাবে তুঁত পাতার চাহিদার উপর প্রভাব ফেলছে। সারণী-১(১৫))

৪. ৩ পলু পালন সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ ঃ

রেশম কীট এক প্রকার শীতল রক্ত বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব। এই কীটকে মানুষের সুবিধার্থে বহুকাল ধরে নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় প্রতিপালনের মাধ্যমে গৃহপালিত করা সম্ভব হয়েছে। এ সামান্য কীটের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান তন্তু লুকিয়ে আছে। রেশম কীটকে স্থানীয় ভাষায় পলু বলে। এটা একটা নাজুক প্রকৃতির জীব। হাজার হাজার বছর ধরে পলু পালনের ফলে আজ এরা পুরোপুরি গৃহপালিত হয়ে পড়েছে এবং মানুষ তার প্রয়োজনে একে বাঁচিয়ে রেখেছে। সারা বিশ্বে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ রেশম কীটকে অন্যান্য ফসলের মত জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অল্প পরিশ্রমে বেশী রেশম গুটি ও রেশম সূতা আহরণের পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে কয়েকশত বছর ধরে কিছু এলাকায় রেশম চাষ প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিকালে প্রায় সকল জেলাতেই রেশম চাষ সম্প্রসারণের কাজ চলছে [৬]

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় রেশম চাষে জড়িত দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল বাদে আর সবদেশ বিষুব রেখার উত্তরাঞ্চলে ৫° উত্তর থেকে ৫৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের অবস্থান ২০° উত্তর থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে। তাই এর অবস্থান জলবায়ু ও মাটির গুণগত মান রেশম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। আমি বাংলাদেশের রেশম শিল্পের যে পাঁচটি ধাপকে চিহ্নিত করেছি তার মধ্যে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে রেশম (পলু) পালন। এই রেশম কীট যে রেশম গুটি তৈরী করে সেই রেশম গুটি থেকেই তৈরী হয় রেশম সূতা। আর তাই আমাদের দেখা দরকার আমাদের দেশে পলু পালনের কি কি সমস্যা এবং কি কি সম্ভাবনা রয়েছে। আমি পলু পালনের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য রাজশাহীর মীরগঞ্জ ও ভোলাহাটের পলু পালনকারীদের(বসনী) নিকট থেকে এ সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি যা নিম্নে আলোচনা করা হল-

---

৬. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২ সাল, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

পলুপালনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

রেশম কীট বা পলুপালন একটি জটিল প্রক্রিয়া। রেশম কীট পালন করতে হলে এর জীবন চক্র সম্পর্কে ধারনা থাকতে হয় এবং এই কীট পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয়। এ জন্য পলু পালনের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আর এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। এইগবেষণায় আমি দেখি আমাদের পলুপালনকারীদের ৭০% ভাগ এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বাকী ৩০% ভাগ এর শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ এস.এস.সি পর্যন্ত। কাজেই আমাদের পলু পালনকারীদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। সারণী- ২(১)

পেশার ধরন ঃ

নীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলে যে সমস্ত পলু পালনকারী রয়েছে তাদের মধ্যে ৬০% ভাগ এর মূল পেশা পলুপালন করা এবং ৪০% ভাগ এর এটা সহকারী পেশা। কাজেই আমরা বলতে পারি এখনও এ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা পলুপালনকে নিজেদের জীবিকা অর্জনের প্রধান পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। সারণী-২(২)

পারিবারিক সহযোগিতা ঃ

রেশম চাষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পলুপালন। পলুপালনের কাজে বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধা, বৃদ্ধ সকলেই শ্রম দিতে পারে। আর একটি মজার ব্যাপার হলো পলু পালনের কাজটি ঘরের মধ্যেই করতে হয়। একজন ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী বা মাঝারী চাষী পলু পালন ঘরের আয়তন ও তুঁত পাতার প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টি DFL পারিবারিক শ্রমিক দ্বারা পালন করে বৎসরে যথাক্রমে ৪৮৯৬.০০ টাকা ৩২১২৮.০০ টাকা ও ৭৬১০৪.০০ টাকা আয় করতে পারে। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই ১০০% ভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক সহযোগিতায় এই পলুপালনের কাজ করা হয়ে থাকে।[৭] কাজেই আমরা বলতে পারি আমাদের মত দরিদ্র দেশের দরিদ্র কৃষকের জন্য পলু পালন জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য হতে পারে সারণী-২(৩)

পলু পালনের বন্দ ঃ

বাংলাদেশে গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে দেশে সারা বছর প্রচুর তুঁতপাতা উৎপন্ন হয়। তুঁতপাতা উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বানিজ্যিক পলুপালনকে ৪টি বন্দে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ জৈষ্ঠা, ভাঁদুরী, অগ্রাহায়নী

৭. বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, ১৯৯২, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং চৈতা। ৪টি বন্দের মধ্যে জৈষ্ঠা ও ভাঁদুরী বন্দে প্রচুর তুঁতপাতা পাওয়া যায় কিন্তু অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতার জন্য উন্নত জাতের পলু পালনের সফলতা পাওয়া যায় না। অগ্রহায়নী ও চৈতা বন্দে দুটি পলু পালনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী অথচ এ দুই বন্দে তুঁতপাতার উৎপাদন হ্রাস পায়। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই মীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলের ১০০% চাষীই চারটি বন্দে পলু পালন করে থাকেন। সারণী-২(৪))

পলুপালন করে সফল গুটি উৎপাদন অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উৎপাদক দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। জাপানী রেশম বিজ্ঞানী ডঃ মাতসুমারার তথ্যানুযায়ী পলু পালন ক্রপের সফলতার মূলে উৎপাদকগুলির অবদান (১) তুঁতপাতার মান ৩৮.২%, (২) পরিবেশ ৩৭% (৩) পশুপালন কৌশল ৯.৩%, (৪) রেশম পোকার প্রজাতি ৪.২%, (৫) রেশম ডিম ৩.১% ও (৬) অন্যান্য উপাদান ৬.৬% (তথ্য সূত্রঃ স্মরণিকা, ১৯৯৩, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড)। উপরোক্ত তথ্য থেকে এ কথা পরিকার পলু পালনে সফলতা ও বিফলতার পিছনে তুঁতপাতা ও পরিবেশের ভূমিকা সর্বাধিক। সফল পলুপলনে উপরোক্ত উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রেশম পোকার প্রজাতিঃ

কয়েক ধরনের মথ প্রজাপতি তাদের জীবন চক্রের এক পর্যায়ে রেশম গুটি তৈরী করে। এরা শীতল রক্ত বিশিষ্ট অমেরুদন্ডী প্রাণী। এদের শুককীট মূককীটে রুপান্তরিত হওয়ার প্রাক্কলে বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বা লালা দিয়ে দেহের চারপাশে আবরণ তৈরী করে। নি:সৃত রস বায়ুর সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে উজ্জ্বল চকচকে সূতায় পরিণত হয়। এ সুতার আবরণীকে বলা হয় গুটি বা কুয়া (cocon)। নির্জীব মূককীট অবস্থায় দৈহিক প্রতিকূল আবহাওয়া ও বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করাই তাদের গুটি তৈরীর মূল উদ্দেশ্য হলেও সন্ধানী মানুষ খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে থেকে একে বস্ত্র তৈরীর একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। প্রধানত তুঁতজাত রেশম মথ, এন্ডি রেশম মথ এবং মুগা রেশম মথের গুটি থেকে সূতা সংগ্রহ হয়ে থাকে। সব রেশম পোকার জীবন ইতিহাস মোটামুটি এক রকম। খ্রিষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বে চীন দেশে প্রথম রেশম সনাক্তকরণ এবং উৎপাদন শুরুর পর থেকে শীতল রক্ত বিশিষ্ট এ রেশম কীট মানুষের সুবিধার্থে বহুকাল ধরে নিদিষ্ট আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হতে থাকে। ফলে তুঁতজাত রেশম মথ সম্পূর্ণভাবে গৃহপালিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত রেশমের ৯৫% ভাগই তুঁতজাত রেশম। [৮]

---

৮. বাংলাদেশ ঐতিহ্য ঃ রাজশাহী সিল্ক, মোঃ আবদুর রশীদ খান, উত্তরা সাহিত্য মজলিশ, মনিবাজার, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

তুঁতজাত রেশম পোকার জাতকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ একচক্রী, দ্বিচক্রী ও বহুচক্রী। এছাড়াও আরও কিছু উন্নত জাত রয়েছে যেমনঃ শংকর, নিস্তারী ইত্যাদি।

একচক্রী জাতঃ- বছরে একবার ডিম দেয়, আকারে অত্যন্ত বড়, গুটির ওজন, খোলসের ওজন ও সূতার দৈর্ঘ্য অন্যান্যদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। কিন্তু এরা উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা প্রতিরোধ করতে পারেনা, ফলে আমাদের দেশে এ জাতের পলু পালন করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি।

দ্বি-চক্রী জাতঃ-বছরে দুবার ডিম দেয়। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী একচক্রী জাতের চেয়ে নিম্নমানের হলেও বহুচক্রী জাতের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এ জাতের পলুপালনের প্রচেষ্টা নেয়া হলেও অদ্যাবধি এর প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

বাহুচক্রী জাতঃ- বছরে বহুবার ডিম দেয়। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একচক্রী ও দ্বিচক্রী জাতের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। এ জাতের বৈশিষ্ট্য হল এদের পলু খুব সবল এবং উচ্চতাপ ও উচ্চ আর্দ্রতা সহ্য করার ক্ষমতা অত্যধিক। ফলে বছরের সব সময় তাদের পালন করা যায়।

আমাদের দেশের বাণিজ্যিক পলুপালন দেখা যায় বহুচক্রী জাতের উপর নির্ভরশীল। রেশম শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় তারা শংকর ডিমের পলুপালন করে থাকে। কিন্তু দু:খের বিষয় আমাদের দেশে শংকর ডিমের পলুপালন সম্প্রসারণ করা এখনও সম্ভব হয়নি। শংকর পলুপালনের সুবিধাগুলো হচ্ছেঃ-

(ক) পলুপালন সময়কাল অপেক্ষাকৃত কম।

(খ) অপেক্ষাকৃত কম পাতা খায়।

(গ) প্রতিকূল আবহাওয়া সহনীয় ক্ষমতা বেশী।

(ঘ) কোকন ও সেলের ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী ।

(ঙ) সূতার দৈর্ঘ্য বেশী।

(চ) গুটির আকার আকৃতিতে সমতা।[৯]

এই গবেষণায় আমি দেখি মীরগঞ্জ ও ভোলাহাট অঞ্চলের পলুপালনকারীদের ১০% ভাগ একচক্রী জাত ২০% ভাগ দ্বিচক্রী জাত ৪০% ভাগ বহুচক্রী জাত এবং ৩০% ভাগ ক্ষেত্রে শংকর জাতের পলু পালন করে থাকেন। সারণী -২ (৫))

৯. স্মরণিকা, জাতীয় রেশম সম্মেলন -৯৩, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

পলু পালনের পরিবেশঃ

পলুপালনে পরিবেশের গুরুত্ব অনেক বেশী। বহুদিন থেকে রেশম পোকা বা পলুকে গৃহপালিতভাবে পালন করায় এর সফলতা বা বিফলতা পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান পলু পালনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে তা হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা বায়ু ও আলো । পরিবেশের উপরোক্ত উপাদানগুলোকে আদর্শ পলু ঘরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করে, সফল পলুপালন সম্ভব। সফল পলুপালণের জন্য পলুঘরে ২৩°-২৮° তাপমাত্রা ৭০-৮৫ % আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া মুক্ত বাতাস প্রবাহ ও স্বাভাবিক আলো রেশম পলু পালনে সফলতা আনতে সহায়তা করে। আমাদের দেশের পরিবেশের বৈশিষ্ট্য প্রথমত গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং দ্বিতীয়ত গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া। দেশে সারা বছরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রেকর্ড থেকে দেখা যায় শীতকালে আপমাত্রা ৮-১০° সেলসিয়াস এ নেমে যায় এবং আদ্রতা ৫০-৮০% থাকে এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৫°-৪০° সে: ওঠে আর বর্ষাকালে উচ্চ তাপমাত্রার সাথে আর্দ্রতা ৯০-৯৮% হয়ে যায়। আবহাওয়ার এ চরম প্রতিকূল অবস্থায় পলু পালনে সফলতা অর্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য।

গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া তথা গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া উচ্চ ফলনশীল একচক্রী ও দ্বি-চক্রী জাতের পলু সহ্য করতে পারেনা। উচ্চ ও নিম্ন মাত্রা উভয়ই পলুর শারীরিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটায়। পলুর তৃতীয় থেকে পঞ্চম অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রা থাকলে গুটি করার প্রবনতা কমে যায়। উচ্চ তাপমাত্রার সাথে উচ্চ আর্দ্রতা পলু পালনে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় পলু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রসা রোগে আক্রান্ত হয়।

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার এ চরম অবস্থায় পলুপালনকে সফল করতে হলে পর্যাপ্ত জানালা দরজা সম্বলিত আদর্শ পলুঘর একান্ত প্রয়োজন। পলুঘরে মুক্ত বাতাস প্রবাহের মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কমানো সম্ভব। অপরদিকে শুষ্ক মৌসুমে পলুর ডালায় ভেজা স্পঞ্জ, পলিথিন ব্যবহার করে এবং পলুঘরে পানি ছিটিয়ে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করা যায়।[১০] এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই মীরগঞ্জ ও ভোলাহাট অঞ্চলের বসনীদের ৬০% ভাগ এরই কোন পৃথক পলুঘর নেই। তারা তাদের বসবাস করার ঘরে পলু পালন করে থাকে। বাকী ৪০% ভাগ এর পলুঘর আছে। কাজেই আমরা যাদের পৃথক কোন পলুঘর নেই তাদের কাছ থেকে পলু পালনে সফলতা আশা করতে পারিনা। সারণী - ২ (৬)

---

১০. স্মরণিকা, জাতীয় রেশম সম্মেলন -৯৩, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

তুঁত পাতার মান ঃ

তুঁতপাতার পুষ্টিমানই পলু পালনে সফলতা নির্ধারন করে সবচেয়ে বেশী। তুঁতপাতার পুষ্টিমানকে ঠিক রাখতে হলে তুঁতের জমিতে সুষম সার প্রয়োগ ও সেচ একান্ত জরুরী। সফল পলুপালনের লক্ষ্যে তুঁতপাতার পুষ্টিমানকে ঠিক রাখার জন্য সব সময় সতেজ পাতা খেতে দেয়া দরকার। এ জন্য পাতা ওঠানো, পরিবহন ও সংরক্ষনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই গবেষনায় আমি দেখি মীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলের ১০০% ভাগ বসনীদের তুঁতপাতা সংরক্ষনের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পলুকে সতেজ তুঁতপাতা খেতে দেয়া হয় না। কাজেই আমরা এ ক্ষেত্রে গুটি উৎপাদনে সফলতা আশা করতে পারিনা। সারণী-২(৭)

পলু পালন কৌশল ঃ

ক) পলু পালন কারীদের প্রশিক্ষণ ঃ

পলু পালন একটি কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন পেশা যা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রচেষ্টা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। পলু দীর্ঘ দিন থেকে গৃহপালিত হওয়ায় এর সফলতা বেশ কিছু কলা কৌশলের উপর নির্ভর করে যেমনঃ- আদর্শ পলুঘর, পলুপালন সরঞ্জামাদি, (ডালা, চন্দ্রকী, ঘড়া ইত্যাদি) পলুঘর ও সরঞ্জামাদি বিশোধন, চাকী পলু পালন, ইনকুবেশন ও পলুপালন কালীন যত্ন উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত লোকের পক্ষে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া এ সমস্ত কাজ করা সম্ভবই নয়। মীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলের চাষীদের ৬০% ভাগেরই পলু পালন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নাই এবং ৪০% ভাগের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে। কাজেই বেশী ভাগ বসনীই প্রশিক্ষণ ছাড়া এ কাজ করছে। কাজেই এ সমস্ত পলুপালনকারীদের কাছে আমরা উন্নত মানের গুটি আশা করতে পারিনা। সারণী- ২ (৮)

খ) পলু পালন সরঞ্জামাদী ঃ

একটি আদর্শ পলুঘরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পলুপালনের জন্য কিছু সরঞ্জামাদী প্রয়োজন। যথাঃ ডালা, চন্দ্রকী, ঘড়া, পাতাকাটা ছুড়ি, ফোমপ্যাড বা স্পঞ্জ, পলিথিন বা মোমযুক্ত কাগজ,সুতার জাল ইত্যাদি। এই গবেষণায় আমরা দেখি ৬০% বসনীর এ সমস্ত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে এবং ৪০% ভাগ বসনীর এ সমস্ত সরঞ্জামাদী রয়েছে। যদিও এ সমস্ত সরঞ্জামাদীর মূল্য খুব একটা বেশী নয়, কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষ অর্থের অভাবে এই সরঞ্জামগুলোও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে জোগাড় করতে পারেনা।সারণী- ২(৯)

Dhaka University Institutional Repository

পলু ঘর ও সরঞ্জামাদী বিশোধন ঃ

পলু পালনের পূর্বে অবশ্যই পলুঘর ও সরঞ্জামাদী ২% ফরমালিন অথবা ৫% ব্লিচিং দ্রবনে বিশোধন করা একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে বলা যায় আমাদের দেশে বেশীর ভাগ পলু ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক জাতীয় জীবানুর প্রভাবে কালশিরা বা ফ্লাচারী, রসা বা গ্রাসারী এবং চুনাকাঠি বা মাসকারডিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। উপরোক্ত জীবানুগুলো বায়ুবাহিত এবং সংক্রামক যা যথানিয়মে বিশোধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাই আমাদের বসনীদের ৭০% ভাগই পলুঘর ও পলু পালনের সরঞ্জামাদী সঠিকভাবে বিশোধন করেনা, ৩০% ভাগ বসনী সঠিকভাবে বিশোধন করে থাকে। কাজেই সফল পলু পালনের এই শর্তও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না সারণী- ২ (১০)

ঘ) বিজ্ঞান সম্মত চাকীপলুপালন ঃ

রেশম শিল্পে উন্নত প্রতিটি দেশে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাকীপলুপালন করা হয়ে থাকে। চাকীপলুপালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোট অবস্থায় পলুকে স্বাস্থ্যবান ও বলবান করা। যে পলুকে ছোট অবস্থায় উপযুক্ত পরিবেশে পুষ্টিযুক্ত পাতা খাইয়ে বলবান অবস্থায় পালন করা হয় তা বড় হলে সহজে রোগাক্রান্ত হয় না ফলে উন্নত মানের গুটি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে চাকী পদ্ধতিতে পলু পালন চালু করা হয়নি ফলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেখানে ১০০ DFL থেকে ৪০-৫০ কেজি গুটি পায় সেখানে আমাদের দেশে মাত্র ১৫-২০ কেজি গুটি পাওয়া যায়।[১১]

এছাড়াও পলু পালন সফল করার জন্য ডিমের যথাযথ ইনকুবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা করলে উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সকল ডিমের ভ্রুণ সমানভাবে বৃদ্ধি পায় এবং একসংগে মুখায়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৫° সে: এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৭৫-৮০%) ডিম ইনকুবেশন করলে ডিম থেকে পলু স্বাস্থ্যবান অবস্থায় মূখায় যা সফল পলুপালনের জন্য খুবই সহায়ক।

রেশম কীটের রোগ ঃ

তুঁত রেশম কীট সম্পূর্ণ গৃহপালিত ও শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী বলে প্রাকৃতিক পরিবেশের সামান্য হেরফের হলেই এরা সহজেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও এদের

---

১১. স্মরণিকা, জাতীয় রেশম সম্মেলন -৯৩, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত পাঁচটি প্রধান রোগ আমাদের দেশে দেখা যায় এগুলো হচ্ছেঃ- (১) পেব্রিন বা কটা রোগ,(২) ফ্লাচারী বা কালশিরা রোগ, (৩) গ্রাসারী বা রসারোগ, (৪) গ্যাটিন বা স্বল্পা রোগ, (৫) মাসকারডিন বা চুনাকাঠি রোগ । এছাড়া এদেশে উজি মাছি নামক একটি কীট পলু পোকাকে ব্যাপকভাবে আক্রমন করে।[১২]

পলুপালনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে পলুর রোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পেব্রিন রোগ ছাড়া পলুর অন্যান্য সকল রোগেরই তুঁত পাতার মান, পলুপালন কালের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পেব্রিন (কটা রোগ) রেশম পোকার একটা মারাত্মক রোগ হলেও আমাদের দেশে বাণিজ্যিক পলুপালন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কালশিরা বা ব্যাকটেরিয়া এবং রসা বা ভাইরাসজনিত রোগ দ্বারা, পলুর বিভিন্ন রোগে বাণিজ্যিক ক্রপের যে ক্ষতি হয় তার প্রায় ৪৫ শতাংশ ব্যাক্টেরিয়া ও ৩৫ শতাংশ ভাইরাসজনিত কারণে হয়ে থাকে। পলুঘরের উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা, নিম্নমানের তুঁত পাতা, নিয়ম অনুযায়ী ডিম ইনকুবেশন না করা, পলু ঘরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ না করা, বিষাক্ত পাতা এবং পলু ঘরে অতিরিক্ত ফরমালিনের ঝাঁঝালো গন্ধ কালশিরা ও রসা রোগের জীবানু আক্রননের জন্য সহায়ক। এ দুটো রোগের হাত থেকে পলুকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে ঃ-

১. পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদী বিশোধন,

২. পলুকে বয়স অনুপাতে পুষ্টিমানের পাতা খাওয়ানো,

৩. পলু পালনের সময় পলু ঘরের তাপমাত্রা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচল সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা ,

৪. পলুর বৃদ্ধি অনুযায়ী বেড বা জায়গা বৃদ্ধি করে দেয়া।[১৩]

---

১২. বাংলাদেশের ঐতিহ্যঃ রাজশাহী সিল্ক, মোঃ আবদুর রশীদ খান, উত্তরা সাহিত্য মজলিস, মনিবাজার, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ১১৪

১৩. বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং কোন রোগ দমনে কেবল রোগ জীবানু দমনের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে সফলতা আশা করা যায়না। বরং রোগ উৎপত্তির কারণগুলি সংশোধনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। কোন রোগ আক্রমনের পূর্বে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যত সহজ আক্রান্তের পর তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বের সারণীর আলোচনা থেকে আমি দেখতে পাই যে আমাদের বসনীদের পলুর রোগ থেকে রক্ষার যে সমস্ত উপায়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সহজেই পলু বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং প্রতি বছর অনেক পলু মারা যায়। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই ১০% জন বসনীর মতে রোগাক্রান্ত হয়ে পলুর মৃত্যুর হার ২৫% এর নীচে। ৮০% ভাগ বসনীর মতে পলু পালন করার সময় বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫% ভাগ পলুর মৃত্যু হয় এবং ১০% জনের মতে মৃত্যুর হার ২৫% এর উপরে। সুতরাং আমরা বলতে পারি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাবে পলুর মৃত্যু পলুপালনে সফলতা অর্জনের একটা প্রধান বাধা। (সারণী-২ (১১)

মূলধনঃ পলু পালনের জন্য সাধারণত স্থায়ী মূলধন হিসাবে পলুঘর নির্মাণ এবং পলু পালনের অন্যান্য সরঞ্জামাদীর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় এবং চলতি মূলধন হিসাবে ডিম ক্রয়, তুঁতপাতা ক্রয়, ঔষধ ক্রয়, শ্রমিকের মজুরী এগুলোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। আমাদের বসনীদের ৫০% ভাগ নিজস্ব তহবিল থেকে এই মূলধন সরবরাহ করে থাকে এবং ৫০% ভাগ নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা ও দেশীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। যদিও পলু পালনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র লোকের পক্ষে এই মূলধন সরবরাহ করাই অনেক সময় কঠিন সমস্যায় পরিণত হয়। সারণী -২ (১২))

পলু পালনের অর্থনৈতিক দিক ঃ

বাংলাদেশে যে সমস্ত অর্থকারী ফসল রয়েছে তার মধ্যে রেশম হল একটি। এই রেশম চাষ বা পলু পালনের মাধ্যমে আমাদের দরিদ্র কৃষক ঘরে বসে কম বিনিয়োগে অধিক লাভবান হতে পারে। এই পলুপালনের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ মহিলাসহ কর্মহীন মানুষের জন্য এটি একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র। নিম্নে ১০০ DFL পলু পালনের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ক) প্রাথমিক (অনাবর্তক) খরচ ঃ

নং	খরচের বিবরণ	টাকা
১।	পলুঘর নির্মাণ	৫০০০.০০
২।	২০ টি বাশের ডালা প্রতিটি ৫০/- টাকা হিসাবে	১০০০.০০
৩।	১৫ টি চন্দ্রকী প্রতিটি ৭৫/- টাকা হিসেবে	১১২৫.০০
	মোট =	৭১২৫.০০

এই প্রাথমিক ব্যয় মোট ৫ বছরের জন্য ধরলে প্রতি বছরের জন্য ব্যয় পড়বে ১৪২৫.০০ টাকা। বৎসরে ৮ বা পলু পালন করলে প্রতিবারে পলুপালনে খরচের অংশ পড়বে প্রায় ১৭৮ টাকা।

খ) পলু পালন খরচ ঃ

নং	খরচের বিবরণ	টাকা
১।	১০০ টি রোগমুক্ত রেশম ডিমের মূল্য	৩০.০০
২।	প্রথম ১০ দিনে ৫ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	১৫০.০০
৩।	পরবর্তী ৫ দিনে মোট ৫ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	১৫০.০০
৪।	পরবর্তী ৭ দিনে মোট ১৪ জন শ্রমিক ৩০/- টাকা হারে	৪২০.০০
৫।	বিশোধন ও অন্যান্য খরচ বাবদ	৫০.০০
৬।	৬৫০ কেজি তুঁত পাতার মূল্য	৮১০.০০
৭।	প্রাথমিক খরচের অংশ	১৭৮.০০
	গুটি উৎপাদন মোট খরচ প্রায় =	১৭৮৮.০০

১০০ DFL পলু পালন করলে গুটি উৎপন্ন হবে প্রায় ৩০ কেজি যার বিক্রয় মূল্য প্রায় ২৪০০.০০ টাকা। সুতরাং ১০০টি DFL-এর পলুপালন থেকে নীট মুনাফা হবে ২৪০০.০০ - ১৭৮৮.০০ = ৬১২.০০ টাকা। অর্থাৎ বছরে ৮ বার পলু পালন করে নীট মুনাফা হবে ৪৮৯৬.০০ টাকা। শ্রমিক নিয়োগ না করে বাড়ীর লোকজন দ্বারাই পলু পালন কাজ করলে মোট মুনাফা হবে কমবেশী ১০,৫০০ টাকা।[১৪]

উৎপাদিত রেশম গুটির বিপনন ঃ

রেশম গুটির সুষ্ঠ বিপনন ব্যবস্থার অভাব বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উন্নয়নের একটি প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর রেশম শিল্পে উন্নত দেশ সমূহে রেশমগুটি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নিদিষ্ট কোকন মার্কেট রয়েছে যা আমাদের দেশে নেই। মীরগঞ্জ এবং ভোলাহাট অঞ্চলে উৎপাদিত রেশমগুটি সাধারণত ৩০% ভাগ বসনী নিজস্ব সূতা তৈরীর কাজে ব্যবহার করেন, ৩০% রেশম বোর্ডের কাছে বিক্রয় করেন, ১০% ভাগ সাধারণ সুতা উৎপাদনকারীর কাছে বিক্রয় করেন, ২০% ভাগ দালাল বা ফড়িয়াদের কাছে এবং বাকী ১০% ভাগ এন.জি.ও.দের কাছে বিক্রয় করেন। (সারণী -২ (১৩)

---

১৪. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২ পৃ. ৪৬ - ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

রেশম গুটি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণঃ

এই গবেষণায় আমরা দেখি রেশমগুটির চাষের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে ৩০% ভাগ এর মত হল মূলধনের অভাব ২০% ভাগ এর মতে বিদেশী সূতার আমদানী ৩০% ভাগ এর মতে রেশম গুটির দাম কম বা অলাভজনক, ১০% ভাগের মতে DFLএর অভাব এবং ১০% ভাগ এর মতে তুঁত পাতার অপর্যাপ্ততা। (সারণী -২ (১৪))

রেশম পোকা বা পলু পালনের উন্নতি সম্পর্কে বসনীদের মতামতঃ

আমাদের দেশে রেশম চাষ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। রেশম চাষ উন্নয়নে ভোলাহাট ও মীরগঞ্জ অঞ্চলের বসনীদের শতকরা ৩০ ভাগের মত হল- রেশমগুটির চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে, শতকরা ২০ ভাগ এর মতে বিদেশী সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ করতে হবে; শতকরা ২০ ভাগের মতে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে, শতকরা ২০ ভাগের মতে রেশমগুটির দাম বৃদ্ধি করতে হবে এবং শতকরা ১০ ভাগের মতে রেশম ডিমের দাম কমাতে হবে। (সারণী -২(১৫)

৪. ৪ রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ ঃ

রেশম সুতা ও রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের জানা দরকার রেশম রিলিং ও স্পিনিং কাকে বলে। রেশম গুটি থেকে রেশম সূতা আহরনের পদ্ধতিগুলিকে রিলিং ও স্পিনিং দু'ভাগে ভাগ করা যায়। রিলিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভাল রেশম গুটি থেকে অবিচ্ছিন্ন চিকন সূতা তোলা হয় আর স্পিনিং পদ্ধতিতে সাধারণত রিলিং এ অব্যবহারযোগ্য ত্রুটিযুক্ত রেশম গুটি ও রিলিং এর উপজাত ঝুট, টোপা ও লাট গুটি থেকে সূতা পাকানো হয়। রিলিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত সূতাকে কাঁচা রেশম আর স্পিনিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত সূতাকে স্পান রেশম বলে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা রেশমের প্রায় ৮০% ভাগ মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র বা শাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্য দিকে স্পান রেশম দিয়ে সার্টিং, পর্দা, বেডকভার, চাদর, টেবিলম্যাট ইত্যাদি বস্ত্র তৈরী করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদিত রেশম বস্ত্র নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আকর্ষণীয় ও অভিজাত। তাই রিলিং ও স্পিনিং কোন পদ্ধতিরই গুরুত্ব কম নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে মহিলাদের বেকারত্ব দূর অর্থাৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রিলিং ও স্পিনিং প্রক্রিয়ার অন্য কোন বিকল্প নেই। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে রিলিং ও স্পিনিং এর মাধ্যমে রেশম উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিহার্য।[১৫] রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি নবাবগঞ্জের ভোলাহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। সুতা প্রস্তুতকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হল।

১৫. বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষগত যোগ্যতা ঃ

রেশম সূতা তৈরী করতে হলে সূতা প্রস্তুতকারীদের রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে । ভোলাহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের ৬০% জনই সর্বোচ্চ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে বাকী ৪০% ভাগ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। কাজেই আমরা বলতে পারি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সারণী -৩ (১)

পেশার ধরণ ঃ

এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই ভোলাহাট অঞ্চলে যে সমস্ত সূতা প্রস্তুতকারী রয়েছে তাদের ৬০% জনের মূল পেশা হল সূতা তৈরি এবং ৪০% জনের এটা সহকারী পেশা। কাজেই আমরা বলতে পারি এ সমস্ত সূতা প্রস্তুতকারীদের ৬০% ভাগেরই এটা জীবিকা অর্জনের একটা প্রধান অবলম্বন হিসাবে কাজ করছে। সারণী -৩ (২)

সূতা প্রস্তুতকারীদের প্রশিক্ষণ ঃ

উন্নত মানের রেশম সূতা তৈরীর জন্য এ সম্পর্কিত কার্যাদির উপর সূতা প্রস্তুতকারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। সূতা প্রস্তুতের দক্ষতা না থাকলে উন্নত মানের রেশম সূতা তৈরী সম্ভব নয়। আমাদের সূতা প্রস্তুতকারীদের ৩০% ভাগ এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন আর বাকী ৭০% ভাগেরই এ সম্পর্কিত কোন প্রশিক্ষন নাই। কাজেই তাদের কাছ থেকে আমরা উন্নত মানের সূতা আশা করতে পারিনা। সারণী -৩ (৩)

রেশম গুটির মান ঃ

রেশম কীটের জাতভেদে গুটির আকৃতি সাধারণত: লম্বাটে, ডিম্বাকৃতি এবং বর্ণ হলুদ বা সাদা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় জাতের রেশম গুটি লম্বাটে, পাতলা, অধিক ফেঁসোযুক্ত এবং হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। এতে মাত্র ৩০০-৪০০ মিটার সূতা থাকে। আবার এ দেশেরই উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের রেশমগুটি ডিম্বাকৃতি হলুদ, শক্ত, আকৃতিতে বেশ বড় এবং ফেঁসোবিহীন হয়ে থাকে। এগুলি থেকে প্রায় ৭০০-৮০০ মিটার সূতা পাওয়া যায়। বিদেশী জাতের গুটি সাদা রংএর, ডিম্বাকৃতি, অনেক বড় যাতে ১০০০-১২০০ মিটার সূতা থাকে। দেশী জাতগুলো বছরের সব ঋতুতেই কম বেশী পালন করা হয়।

উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতগুলি অগ্রহায়নী এবং চৈতা ঋতুতে বেশীর ভাগ পালন করা হয়। সাধারণত দৃঢ় খোলসযুক্ত ফেঁসোবিহীন সমান আকারের রেশম গুটিকে উন্নত মানের গুটি বলা হয়। লাভজনকভাবে রিলিং করতে হলে সব সময়ই উন্নতমানের রেশমগুটি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই ভোলাহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের ৪০% ভাগ উন্নতমানের রেশমগুটি দ্বারা সূতা প্রস্তুত করে থাকেন আর বাকী ৬০% ভাগ নিম্নমানের রেশম গুটি দ্বারা সূতা প্রস্তুত করে থাকেন। সুতরাং নিম্নমানের রেশমগুটি থেকে আমরা উন্নতমানের সূতা আশা করতে পারিনা। সারণী- ৩ (৪)

রেশমগুটি শুকানোঃ

ভাল সূতা পাওয়ার জন্য রেশমগুটি সঠিকভাবে শুকানোর প্রয়োজন হয়। ভালভাবে শুকানো রেশম গুটি ইচ্ছামত সংরক্ষণ করা যায় এবং সুবিধামত ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকটি বড় রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কিছু বেসরকারী সংস্থা ছাড়া রেশমগুটি শুকানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা ক্ষুদ্র রিলাদের একেবারে নেই। দেশে উৎপাদিত ৬০-৭০ ভাগ রেশম গুটি সাধারণত রৌদ্রে শুকানো হয়। বর্ষা মৌসুমে রিলাররা গুটি নিয়ে বিপাকে পড়ে। অনেকে চুলোর উপর টিন দিয়ে তাতে রেশম গুটি দিয়ে পুত্তলি মেরে ফেলে। এতে গুটি পুড়ে যাবার ভয় থাকে এবং সুতা ঠিকমত ওঠে না। বাজারে বৈদ্যুতিক ড্রায়ার পাওয়া গেলেও তা সাধারণ রিলারদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এবং যেখানে বিদ্যুৎ নেই অর্থাৎ বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলেই ব্যবহার উপযোগী নয়। বাংলাদেশ রেশম গবেষণাগার এমন একটি কাঠের ড্রায়ার প্রস্তুত করেছে যা দেশের যে কোন স্থানে স্থাপন করা সম্ভব এবং মূল্যও পরিচালনা ব্যয় সাধ্যের মধ্যে।

423201

সূতা রিলিং ও স্পিনিং ঃ

রিলিং ও স্পিনিং এর জন্য আমাদের দেশে ৩ রকম পদ্ধতি চরকা, কাঠঘাই ও উন্নত মেশিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চরকা এবং কাঠঘাই পদ্ধতিতে উৎপাদিত সূতার মান অনেক খারাপ হয়ে থাকে। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই ভোলহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের ২০% ভাগ চরকার মাধ্যমে সূতা স্পিনিং এর কাজ করেন, ৭০% ভাগ কাঠঘাই মেশিনে স্পিনিং করে এবং ১০% ভাগ উন্নত মেশিনে রিলিং করে থাকে। অতএব, আমরা বলতে পারি চরকা এবং কাঠঘাই মেশিনের ব্যবহার উন্নতমানের রেশমসূতা উৎপাদনের একটা প্রধান বাধা। উন্নতমানের চিকন এবং মসৃণ রেশম সূতা কাটায়ের জন্য উন্নত মানের রিলিং মেশিন অবশ্যই দরকার। সারণী -৩ (৫)

ডেনিয়ার নিয়ন্ত্রণঃ

ডেনিয়ার বা সাইজ রেশম সূতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যার উপর এর মান এবং মূল্য দুই-ই নির্ভর করে। সাধারণ অর্থে ৯০০০ মিটার রেশম সূতার (পাকবিহীন) ওজন যত গ্রাম তাকে তত ডেনিয়ার বলে। অর্থাৎ ২০/২২ ডেনিয়ার রেশম সূতা বলতে

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৯০০০ মিটার পাকবিহীন সূতার ওজন হবে ২০/২২ গ্রাম। কিন্তু ডেনিয়ার স্কেলে মাপার সময় মাত্র ৪৫০ মিটার রেশম সূতা ইউফর বেট নামক মেশিনে জড়িয়ে নিয়ে স্কেলে একপ্রান্তে চাপিয়ে দিলে আপনা আপনি তার ডেনিয়ার নির্দেশ করবে। মান সম্পন্ন রেশম সূতার সব জায়গাতেই প্রায় একই ডেনিয়ার থাকে। কারণ সূতা রিলিং করার সময় সর্বদা নির্দিষ্ট সংখ্যক (যেমন - ২০ /২২ ডেনিয়ারের জন্য ১০টি গুটি) গুটি রিলিং প্রান্তে রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উৎপাদিত সূতায় কখনই ডেনিয়ার সমান থাকে না। বরং দেখা যায় ২০/২২ ডেনিয়ার সূতার সর্বনিম্ন ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ ডেনিয়ার রয়েছে। এর প্রধান কারণ উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে রিলাররা গুটির সংখ্যার দিকে ঠিকমত খেয়াল দিতে পারে না। কাজেই সুতার ডেনিয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য রিলিং প্রান্তে গুটির নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সচেতন হতে হবে।[১৬]

রিলিং ইউনিট স্থাপনের অর্থনৈতিক দিক ঃ

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০% ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। গ্রামের এই সমস্ত অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা পুরুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের রিলিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে তাদের অর্থসংস্থান করতে পারেন।

এক ইউনিট উন্নত চরকা (উন্নত কাঠঘাই, ইন্ডিয়ান টাইপ)-এর অর্থনৈতিক দিক- রেশমগুটি হতে সুতা কাটাই এর জন্য মাত্র একটি উন্নত চরকা স্থাপন করা যেতে পারে। এতে সর্বমোট প্রারম্ভিক সংস্থাপন ব্যয় হবে টাকা ৮০০০/=। বাড়ীর আংগিনায় অথবা বাহির ঘরের বারান্দায় এ চরকাটি স্থাপন করা যেতে পারে। গৃহকর্তা অথবা গৃহকত্রী নিজেই এর দেখাশুনা করতে পারেন। ২৫ কর্ম দিবস অর্থাৎ এক মাস বা এক মৌসুম চালাতে এতে ১৮৮কেজি রেশম গুটির প্রয়োজন যা ক্রয়ের জন্য ১৫০০০.০০ টাকা ব্যয় সহ মোট প্রায় ১৮,০০০.০০ টাকা চলতি মূলধন প্রয়োজন হবে। উক্ত মূলধন আবর্তক তহবিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। উৎপাদিত সূতা ৭ দিন পর পর বিক্রয় করতে পারলে তাড়াতাড়ি পুঁজি আবর্তন করা যাবে। তবে আশা করা যায় এক মৌসুমের সূতা পরবর্তী মৌসুমের পূর্বেই বিক্রি করা সম্ভব হবে। ভাড়া করা শ্রমিক নিযুক্ত করা হলে এ থেকে বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে ১২,২৯৭.০০ টাকা যা মোট বিনিয়োগ ব্যয় (৮০০০.০০ +১৮,০০০.০০) = ২৬,০০০.০০ টাকার প্রায় ৪৭.৩০%। পরিবারের সদস্যগণ নিজেরাই কাজ করলে (২.৫ জন) নীট আয় দাঁড়াবে ১২,২৯৭.০০ + ১৫,০০০.০০ = ২৭,২৯৭.০০ টাকা। চার এন্ডের এরূপ ১টি চরকা স্থাপন ও পরিচালনার বাৎসরিক (২০০ কর্ম দিবস) আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

---

১৬. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

(ক)	**সংস্থাপন ব্যয়**	**মোট ব্যয় ঃ**
	খরচের খাত	
১।	চরকা ক্রয় / তৈয়ারী (সংস্থাপন খরচসহ)	৭০০০.০০
২।	বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় (বালতি, হাতা, মুঠা ইত্যাদি)	১০০০.০০
		মোট ঃ ৮০০০.০০
(খ)	আয় ব্যয় বিশ্লেষণ ঃ	
	(বৎসরে ২০০ কর্ম দিবসে)	
	ব্যয়ঃ	
১।	কাঁচামাল (রেশম গুটি) ক্রয় ৭.৫×২০০ = ১৫০০ কেজি ঃ	১,১০,০০০.০০
	গড় দর ঃ ৮০/= টাকা প্রতি কাহন।	
২।	জ্বালানী ক্রয় (কাঠ) ২৫×২০০=৫০০০ কেজি	৬২৫০.০০
	দরঃ ১.২৫/= টাকা প্রতি কেজি	
৩।	মজুরী খরচ ঃ ২.৫ × ২০০ = ৫০০ জন -	১৫,০০০.০০
	মজুরী হার ৩০ টাকা প্রতিদিন	
৪।	গুটি শুকানো খরচ (জ্বালানী সহ) প্রতি কেজি ১/= টাকা হারে	১,৫০০.০০
৫।	খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত	১০০০.০০
৬।	অবচয় $\left(\frac{৭০০০}{২০}\right) + \left(\frac{১০০০}{৩}\right)$	৬৮৩.০০
৭।	অন্যান্য খরচ (পরিবহন, রক্ষণাবেক্ষন ও বিবিধ অদৃশ্য খরচ)	৩২০০.০০
৮।	সংস্থাপন ব্যয়ের উপর সুদ (৮০০০.০০ টাকার ১৫%)	১,২০০.০০
৯।	চলতি মূলধণের উপর সুদ (১৮,০০০.০০ টাকার ১৫%)	২,৭০০.০০
	মোট ব্যয় ঃ	১,৫১,৫৩৩.০০
আয়ঃ		
১।	১০৭.১৪ কেজি কাঁচা রেশমের (রেশম সুতা) মূল্য	১,৬০,৭১০.০০
	১.৫০০.০০ টাকা প্রতি কেজি হিসেবে	
	(১ ঃ ১৪ রেনডিটা হিসেবে)	
২।	উপজাত দ্রব্যের মূল্য ঃ	
	(ক) ঝুট ঃ	
	$\left(\frac{১৫০০}{১৫}\right) \times \left(\frac{৮}{১০}\right)$ = ৮০ কেজি	২৩২০.০০ টাকা
	দরঃ ২৯/= টাকা প্রতি কেজি	
	(খ) টোপা ঃ	
	$\left(\frac{১৫০০}{১৫}\right) \times \left(\frac{২}{১০}\right)$ = ২০ কেজি	
	দরঃ ৪০/= টাকা প্রতি কেজি	৮০০.০০ টাকা
	মোট আয় ঃ	১,৬৩,৮৩০.০০

নীট আয় = (মোট আয় - মোট ব্যয়)

নীট আয় = ১,৬৩,৮৩০.০০ - ১,৫১,৫৩৩.০০ = ১২,২৯৭.০০/= টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

* সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার ইউনিটের মালিক নিজেই নিয়োজিত থাকবেন।

* রেনডিটা গড় ১৪ ধরা হয়েছে। আবহাওয়া গত কারণে রেশম গুটির মানের বিচ্যুতি ঘটলে এ হার ১২ থেকে ১৬ এর মধ্যে থাকবে। সেক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে গুটির দর ওঠানামা করবে।

* চরকার আয়ুষ্কাল ২০ বৎসর এবং বিবিধ সরঞ্জামাদির আয়ুষ্কাল ৩ বৎসর ধরে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

কার্য ঘন্টা = ৮ ঘন্টা / প্রতিদিন ধরা হয়েছে।

১ রেনডিটা গুটি ও সুতার আনুপাতিক হার নির্দেশ করে আলোচ্য কেন্দ্রে ১৪ কেজি গুটি থেকে ১ কেজি সূতার প্রাপ্তি বুঝান হয়েছে।[১৭]

মূলধন ঃ

রেশম গুটি হতে সূতা তৈরী করতে চরকাক্রয়, বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় করার জন্য স্থায়ী মূলধন, এছাড়া রেশম গুটি ক্রয়, জ্বালানী, শ্রমিকের মজুরী, পরিবহন, রক্ষণাবেক্ষণ, গুটি শুকানো ইত্যাদির জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। ভোলাহাট অঞ্চলের দরিদ্র সূতা প্রস্তুতকারীদের পক্ষে এই মূলধন সব সময় সঠিকভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

এই সমস্ত সূতা প্রস্তুতকারীদের ৪০% জন নিজস্ব তহবিল থেকে এই মূলধন সরবরাহ করে থাকে এবং বাকী ৬০% জন ই নিজস্ব ও ঋণের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। তারা রেশম বোর্ড, এনজিও এবং দেশীয় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে এই ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। সারণী -৩ (৬)

রেশম সূতার বাজারজাত করণঃ

ভোলাহাট অঞ্চলে বেশীর ভাগ রেশম সূতাই কাঠঘাই (চরকা) -এর মাধ্যমে তৈরী হয়ে থাকে। কাঠঘাই-এ তৈরী এ সমস্ত সূতার মান অনেক নিম্ন হয়ে থাকে। শিবগঞ্জ এলাকার রেশম তাঁত মালিকরা এবং মীরপুরের বেনারসী তাঁতীরা বিশেষ ধরণের শাড়ী (পটলাকাতান) তৈরীতে এই ধরণের রেশম সূতা ব্যবহার করে থাকেন। ফলে উন্নত কাপড় তৈরীতে আমাদের জামদানী এবং বেনারসী তাঁতীরা আমদানীকৃত বিদেশী সূতার উপর নির্ভর করে থাকে। ভোলাহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের ৭০% ভাগই তাদের উৎপাদিত সূতা কিছু অসাধু মধ্যবর্তী সূতা ব্যবসায়ীদের কাছে অনেক কম মূল্যে বিক্রয় করে থাকেন এবং ৩০% ভাগ ক্ষেত্রে তারা রেশম বোর্ডের ও এনজিওর কাছে বিক্রয় করে থাকেন। ফলে তারা নায্যমূল্য প্রাপ্তি থেক বঞ্চিত হন। সারণী -৩ (৭)

---

১৭. আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ১৯৯২, পৃ. ৬২-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

রেশম সূতার উৎপাদন হ্রাসজনিত কারণ ঃ

ভোলাহাট অঞ্চলে যে সমস্ত সূতা উৎপাদিত হয় তা ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশে তৈরী সূতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। আমাদের দেশের সিল্ক ফ্যাক্টরীগুলোতে যে রেশম বস্ত্র তৈরী হচ্ছে তার অধিকাংশই বিদেশী রেশম সূতা থেকে তৈরী হচ্ছে। এছাড়া কৃত্রিম তন্তু মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে রেশম কাপড়। ভোলাহাট অঞ্চলের সূতা প্রস্তুতকারীদের ২০% ভাগ এর মতে মূলধনের অভাবে সূতা উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ১০% ভাগ এর মতে রেশমগুটির অভাব, ৩০% ভাগ এর মতে চাহিদার স্বল্পতা, ৪০% ভাগ এর মতে বিদেশী সূতার আমদানীর ফলে উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। সারণী ঃ ৩ (৮)

সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরামর্শঃ

সূতার উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করছে। এই কারণগুলোর বিপক্ষে ব্যবস্থা নিলে আমাদের রেশম সূতার উৎপাদনের সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। ভোলাহাট অঞ্চলে সূতা প্রস্তুতকারীগণ এ সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের ৩০% ভাগ এর মতামত হল সূতার নায্য মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪০% ভাগ এর মত হল বিদেশী সূতার আমদানী কমাতে হবে, ৩০% ভাগ এর মতে সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ করতে হবে। সুতরাং সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সারণী-৩(৯)

৪. ৫ রেশম বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণঃ

রেশম শিল্পের চতুর্থ স্তর হল রেশম কাপড় বুনন বা রেশম বস্ত্র উৎপাদন। যদিও বাংলাদেশ এক সময় "Store House of Silk" নামে খ্যাত ছিল কিন্তু বর্তমানে এই রেশম শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের দেশে যে সমস্ত রেশম বস্ত্র তৈরী হচ্ছে তার অধিকাংশ হয় বিদেশী রেশম সূতা বা কৃত্রিম তন্তু মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারী খাতে দুটি রেশম কারখানা রয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর লোকসান দিতে দিতে তা অচল হয়ে পড়ে এবং বর্তমানে এ কারখানা দুটো বন্ধ। রেশম বস্ত্র যতটুকু উৎপাদিত হচ্ছে তা বেরসকারী খাতেই উৎপাদিত হচ্ছে। আমি রেশম বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য নবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগতভাবে যারা রেশম বস্ত্র তৈরী করছে এবং রাজশাহী জেলার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাদের নিকট গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে আমাদের দেশে রেশম বস্ত্র উৎপাদনের যে সমস্ত সমস্যা এবং সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল'-

প্রতিষ্ঠানের মালিকানাঃ

আমাদের দেশে রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ধরণের সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই গবেষণায় আমি দেখি নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার যে সমস্ত রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে ৬০% ভাগ এক মালিকানায় ১০% ভাগ অংশীদারী এবং ৩০% ভাগ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। সারণী- ৪(১)

বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্যঃ

রেশম বস্ত্র উৎপাদন করতে প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকের সংখ্যা কিছু কম হয়ে থাকে এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই গবেষণায় দেখা যায় ৪০% ভাগ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ জন, ২০% ভাগ ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ জন, ২০% ভাগ ক্ষেত্রে ৬০-৮০ জন ১০% ভাগ ক্ষেত্রে ৪১ থেকে ৬০জন এবং বাকী ১০ ভাগ ক্ষেত্রে ৮১ -১০০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং রেশম বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যনে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব। (সারণীঃ ৪ (২)১উন্নতমানের রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করতে হলে আমাদের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিকের। গবেষণা থেকে দেখা যায় রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ অঞ্চলের বস্ত্র কারখানাগুলোতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করছে তার মধ্যে ৬০% জন শ্রমিকই প্রশিক্ষণ ছাড়া কাজ করছে এবং বাকী ৪০% জন শ্রমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছে। কাজেই আমাদের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ উপযুক্ত দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সারণী - ৪(৩)

মূলধন ঃ

রেশম বস্ত্র উৎপাদন করতে হলে অনেক মূলধনের প্রয়োজন হয়। দালান কোঠা, ভারী যন্ত্রাংশ, খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, ইত্যাদির জন্য স্থায়ী মূলধন এবং কাঁচামাল,শ্রমিকের মজুরী, পরিবহন, বিদ্যুৎ, যন্ত্রাংশ মেরামত ইত্যাদির জন্য অনেক চলতি মুলধনের প্রয়োজন হয়। এই গবেষণায় দেখা যায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ৪০% ভাগ নিজস্ব তহবিল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এই মূলধন সরবরাহ করে থাকে এবং ৬০% ভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিলের মাধ্যমে ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সারণী - ৪(৪)

রেশম বস্ত্র উৎপাদনে তাঁত ব্যবহারের ধরণঃ

আমাদের দেশে যে রেশম বস্ত্র তৈরী হয় তা পূর্বে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে তৈরী করা হত। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে হস্ত, বিদ্যুৎ এবং উভয় হস্ত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সাহায্যে রেশম কাপড় বুননের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষনা থেকে আমি দেখতে পাই ৪০% ভাগ ক্ষেত্রে হস্তাচালিত তাঁতের সাহায্যে, ৩০% ভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সাহায্যে, ৩০% ভাগ ক্ষেত্রে উভয় হস্ত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সাহায্যে রেশম বস্ত্র উৎপাদনের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। সারণী -৪ (৫)

রেশম বস্ত্র উৎপাদনে দেশী ও বিদেশী সূতার ব্যবহারঃ

এমন একটা সময় ছিল যখন দেশী রেশম সূতার সাহায্যে আমাদের রেশম বস্ত্র তৈরী করা হত। কিন্তু বর্তমানে যতদিন যাচ্ছে তত বিদেশী সুতার উপর আমাদের রেশম বস্ত্র উৎপাদন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ অঞ্চলে যে সমস্ত বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে ১০% জন রেশম বস্ত্র উৎপাদনে দেশী সূতা ব্যবহার করছেন ৬০% জন বিদেশী সূতা ব্যবহার করছেন এবং বাকী ৩০% জন উভয় দেশী ও বিদেশী ধরণের সূতা ব্যবহার করছেন। সুতরাং,এখানে থেকেই আমরা বুঝতে পারি রেশম বস্ত্র উৎপাদন কতখানি বিদেশী সূতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশী রেশম সূতার বস্ত্র প্রায় বিলুপ্তির পথে। সারণী- ৪(৬)

উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণঃ

উন্নত মানের রেশম বস্ত্র উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন। আমাদের রেশম বস্ত্র উৎপাদন কারখানাগুলোতে ৮০% ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মান নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকেন কারিগর নিজে এবং ২০% ভাগ ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাহায্যে মান নিয়ন্ত্রণের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। সারণী-৪(৭)

বস্ত্র উৎপাদনে রাজনৈতিক প্রভাবঃ

আমাদের দেশে সব সময়ই রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। প্রায় সময়ই বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দলগুলো হরতালের ডাক দিয়ে থাকে এর ফলে উৎপাদন কাজ ভীষণ ভাবে ব্যহত হয়ে থাকে। আমাদের বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৯০ ভাগের মতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের উৎপাদন কাজকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বাকী ১০% ভাগের মতে এর ফলে তাদের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয় না। কাজেই আমরা বুঝতে পারি উৎপাদনের কাজের গতিকে অব্যাহত রাখতে অনুকুল রাজনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে। সারণী - ৪(৮)

বন্টন প্রণালী ঃ

কোন পণ্য কিভাবে বিতরণ করা হবে তা নির্ভর করে বাজারের ধরণ , পণ্যের প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আয়তন, কার্যধারা, প্রতিযোগিতার ধরণ ইত্যাদি উপাদানের উপর। এ সকল উপাদান বিবেচনায় রেখে যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনকারী উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌছে দেয় তাকে বন্টন প্রণালী বলা হয়। আমরা সাধারণত দু' ধরণের বন্টন প্রণালী দেখতে পাই যথাঃ প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী এবং পরোক্ষ বন্টন প্রণালী।

প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালীতে উৎপাদনকারী সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রয় করে এবং পরোক্ষ বন্টন প্রণালীতে উৎপাদনকারী মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে মাল সরবরাহ করে থাকে। এই গবেষণায় আমি দেখতে পাই যে, আমাদের বস্ত্র উৎপাদনকারীদের ৫০% ভাগ নিজেই এবং মধ্যবর্তী ব্যবসীদের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে এবং বাকী ৫০% ভাগ শুধুমাত্র মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বস্ত্র ভোক্তাদের হাতে পৌছিয়ে থাকে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করতে গেলে পণ্যের মূল্য একটু বেশী হয়ে থাকে। সারণী -৪(৯)

বস্ত্রের ডিজাইনঃ

ভোক্তাকে পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে ডিজাইন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বস্ত্রের ডিজাইন ভাল হলে ভোক্তা সেই পণ্যের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয় এবং বস্ত্রের ডিজাইন খারাপ হলে সেই বস্ত্র ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। অনেক ক্রেতা আছে যারা বস্ত্রের মানের চেয়ে বস্ত্রের ডিজাইন এর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কাজেই উচিত বস্ত্রের ডিজাইন যাতে সুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বস্ত্রের ডিজাইন ভাল করতে প্রয়োজন ভাল ডিজাইনারের। আমার জরিপকৃত রেশম বস্ত্রের কারখানাগুলোতে ৫০% ভাগক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিজাইন করার জন্য একজন ডিজাইনার আছেন এবং বাকী ৫০% ভাগ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় কোন ডিজাইনার নাই। বস্ত্রের ডিজাইন যদি ভাল না হয় সেক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাড়ায়। এ জন্য বস্ত্রের ডিজাইনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সারণী- ৪(১০)।

ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতিঃ

বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকতে হলে ভোক্তাদের বিভিন্ন ভাবে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আমাদের বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬০% ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। বাকী ৪০% ভাগ উৎপাদনকারী বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মেলায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতির সাহায্যে তারা ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসার কার্যক্রম আরও উন্নত করা উচিত। (সারণী- ৪(১১)

মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ

পণ্য বিপননে মূল্য নির্ধারণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাবে এই মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। আমাদের বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৮০% ভাগই দেখা যায় উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী পণ্যেরমূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। এছাড়া ১০% ভাগ প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার সাথে খাপ খাইয়ে মূল্য নির্ধারণ করে এবং বাকী ১০% ভাগ প্রতিষ্ঠান ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণে আরও উন্নত কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন। সারণী ঃ ৪ (১২)

পণ্য রপ্তানি ব্যবস্থাঃ

পণ্যের বাজারকে বিস্তৃত করতে অর্থাৎ দূর-দূরান্তের ভোক্তাদের হাতে পণ্য পৌছে দিতে পণ্য রপ্তানি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব। আমাদের বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০% ভাগের পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা রয়েছে এবং ৮০% ভাগেরই পণ্য রপ্তানির কোন ব্যবস্থা নাই। সারণীঃ ৪(১৩)

ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতিঃ

সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ। আমার জরিপকৃত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪০% ভাগ ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে থাকেন এবং ৬০% ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ইউনিট প্রতি ব্যয় নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা নেই। সারণী- ৪(১৪)

Dhaka University Institutional Repository

দেশী বনাম বিদেশী বস্ত্রের চাহিদাঃ

পণ্য বিপননে ভোক্তার চাহিদা, রুচি এবং ফ্যাশন এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে বিদেশী বস্ত্রে আমাদের বাজারগুলো ছেয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশী বস্ত্রগুলো বিদেশী বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। আমাদের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০% ভাগ এর মতে আমাদের ভোক্তাদের দেশী বস্ত্রের প্রতি চাহিদা রয়েছে, ৬০% এর মতে ভোক্তাদের বিদেশী বস্ত্রের প্রতি ঝোঁক বা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং বাকী ১০% জনের মতে দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার বস্ত্রের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সারণী- ৪(১৫)

বাংলাদেশী রেশম বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরামর্শঃ

আমাদের দেশীয় রেশম শিল্প আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশের কারখানাগুলোতে যে সমস্ত রেশম বস্ত্র তৈরী হচ্ছে তার বেশীর ভাগই বিদেশী রেশম সূতার সাহায্যে তৈরী। আমাদের দেশীয় রেশম বস্ত্রের চাহিদা বা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে। তাদের ১০% ভাগের মতে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে, ১০% ভাগের মতে বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে, ২০% এর মতে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, ২০% ভাগ এর মতে বস্ত্রের ডিজাইন-এর মান উন্নত করতে হবে, ২০% ভাগ এর মতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বাকী ২০% জনের মতে সরকারী সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সূতরাং উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ দেশীয় রেশম বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারে। সারণী ঃ ৪(১৬)

৪.৬ খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণঃ

বর্তমান বাংলাদেশে দেশীয় রেশম বস্ত্রের বাজার খুবই খারাপ। আমাদের দেশী সূতায় তৈরী রেশম বস্ত্র এখন পাওয়া যায় না বললেই চলে। যে সমস্ত রেশম বস্ত্র আমরা বাজারে পাই তার অধিকাংশই বিদেশী সূতা থেকে তৈরী এবং কৃত্রিম তন্তু মিশিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। যারা রেশম বস্ত্র চেনেনা তারা কৃত্রিম তন্তু মিশ্রিত বস্ত্র রেশম বস্ত্র ভেবে কিনে ঠকছে। আর এদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে অবাধে আসছে বিদেশী বস্ত্র বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশে ভারত থেকে প্রচুর বস্ত্র আসছে। সেগুলোর রং এবং ডিজাইন আকর্ষণীয় হওয়ায় আমাদের ক্রেতারাও সেগুলো কেনার দিকে বেশী করে ঝুঁকছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি রেশম বস্ত্রের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজশাহী শহরের যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ী রয়েছে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁদের নিকট থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

বস্ত্র সংগ্রহের উৎসঃ

আমাদের দেশে যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ী আছে তারা রেশমবস্ত্র সমূহ বিভিন্ন উৎপাদনকারী ও পাইকারদের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং কেউ কেউ নিজস্ব কারখানার তৈরী কাপড় বাজারে বিক্রয় করে থাকেন। আমার জরীপকৃত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের ৪০% জন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করেন, ২০% জন পাইকারের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন এবং বাকী ৪০% নিজস্ব কারখানার উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় করেন। সারনী ঃ ৫ (১)

উৎপাদনকারীদের সরবরাহকৃত পণ্যের ডিজাইনের মানঃ

বাজারজাত করতে হলে বস্ত্রের ডিজাইন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বস্ত্রের ডিজাইন সুন্দর হলে সেই বস্ত্রের প্রতি ক্রেতারা আকৃষ্ট হয়। আমার গবেষণায় আমি দেখতে পাই বিক্রেতাদের ৬০% ভাগ এর মতে বর্তমানে রেশম বস্ত্রের যে ডিজাইন করা হচ্ছে তা নতুন ডিজাইনের এবং রুচিসম্মত, ৩০% জনের মত হল উৎপাদকারীরা নতুন নতুন ডিজাইনের এবং রুচি সম্মত পণ্য সরবরাহ করতে পারছে না এবং ১০% ভাগ এর মতে ডিজাইন অপরিবর্তীত রয়েছে। সুতরাং আমরা দেখছি বেসরকারী খাতে যে সমস্ত উৎপাদনকারী বস্ত্র তৈরী করছে তাদের তৈরী বস্ত্রের ডিজাইন নিয়ে খুব একটা সমস্যা নেই। সারণী -৫(২)

উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের মানঃ

বস্ত্রবাজারজাতকরণে বস্ত্রের মানও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ৪০% ভাগ এর মতে উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত বস্ত্রের মান আগের তুলনায় ভাল এবং বাকী ৬০% ভাগ এক মতে পণ্যের মান আগের থেকে উন্নতও হয়নি আবার অবনতিও হয়নি, অর্থাৎ পণ্যেরমান অপরিবর্তীত রয়েছে। সারণী-৫(৩)

সরবরাহকৃত পণ্যের ক্রয়মূল্য

খুচরা ব্যবসায়ীরা পণ্য ক্রয় করে তার সাথে লাভ যোগ করে তা বাজারে বিক্রয় করে। কাজেই পণ্যের ক্রয়মূল্য কম হলে তার বিক্রয়মূল্যও বেশী হবে আবার ক্রয় মূল্য

Dhaka University Institutional Repository

বেশী হলে তার বিক্রয়মূল্যও বেশী হবে। কাজেই পণ্য বাজারজাতকরণে পণ্যের ক্রয়মূল্যও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার গবেষণায় আমি দেখি ৩০% ব্যবসায়ীর মতে বস্ত্রের ক্রয়মূল্য বর্তমানে বেশী, ২০% ভাগ ব্যবসায়ীর মতে ক্রয়মূল্য কম এবং বাকী ৫০% জনের মতে ক্রয়মূল্য পূর্বে যা ছিল এখনও তাই আছে বা অপরিবর্তিত আছে। সারণী - ৫ (৪)

সিল্ক কাপড়ের চাহিদা ঃ

পণ্য বাজারজাতকরণে পণ্যের চাহিদাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পণ্যের চাহিদা যত বিস্তৃত হবে সেই পণ্যের উৎপাদনও তত বৃদ্ধি পাবে। মুনাফাও তত বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়াও অব্যাহত গতিতে চলবে। আমাদের ব্যবসায়ীদের ৭০% ভাগের মতে সিল্ক কাপড়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাকী ৩০% ভাগ এর মতে এ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজেই আমরা দেখছি আমাদের সিল্ক কাপড়ের মোটামুটি ভাল চাহিদা রয়েছে। অর্থাৎ সিল্ক কাপড়ের যথেষ্ট বাজার রয়েছে। সারণী - ৫ (৫)

সিল্ক কাপড়ের বিক্রয়মূল্য ঃ

পণ্য বাজারজাতকরনে পণ্যের বিক্রয়মূল্য ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিক্রেতাদের বিক্রয়মূল্য নির্ধারনের সময় এমন ভাবে মূল্য নির্ধারণ করা উচিত যাতে পণ্য বিক্রয় করে সেখান থেকে মুনাফা হয় এবং পণ্যটি যাতে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। আমাদের ব্যবসায়ীদের ৪০% ভাগের মতে সিল্ক রেশম বস্ত্রের বিক্রয়মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০% ভাগ এর মতে বিক্রয়মূল্য কমছে এবং ৪০% ভাগের মতে বিক্রয়মূল্য আগের মত বা অপরিবর্তীত রয়েছে। সারণী - ৫ (৬)

দেশী বস্ত্রের উপর বিদেশী বস্ত্রের প্রভাবঃ

আমরা জানি মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমানে বিদেশী বস্ত্র আমাদের দেশে আসছে। যার ফলে আমাদের দেশীয় বস্ত্রের চাহিদার উপর একটা বিরাট প্রভাব পড়ছে। আমাদের ব্যবসায়ীদের ৬০% ভাগের মতে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বস্ত্র আমাদের দেশী বস্ত্রের চাহিদার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং বাকী ৪০% ভাগের মতে বিদেশী বস্ত্র আমাদের দেশী বস্ত্রের চাহিদার উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলছে না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি বিদেশ থেকে অবাধে আসা বস্ত্র আমাদের দেশী বস্ত্রের উপর অনেকখানিই বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে। সারণী - ৫ (৭)

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্র বিক্রয়ে প্রসার কার্যক্রমঃ

বাজারজাতকরণে প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রসার কার্যক্রম চালান হয়ে থাকে। আর বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে, পণ্যের বিক্রয় বাড়াতে প্রসার কার্যক্রম আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের ব্যবসায়ীদের ৭৫% ভাগ এর মতে তারা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রসার কার্যক্রম চালিয়ে থাকে এবং ২৫% ভাগ বিক্রয় কর্মীর মাধ্যমে প্রসার কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের ব্যবসায়ীদের প্রসার কার্যক্রমে গাফিলতি রয়েছে। সারণী -৫(৮)

মূলধনের উৎস

আমাদের দেশে বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনায় মূলধন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য মূলধন একটি বিরাট সমস্যা। আমার জরিপকৃত ব্যবসায়ীদের ৪০% ভাগ নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করেন, ৫০% ভাগ নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিলের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহ করেন এবং বাকী ১০% ভাগ শুধুমাত্র ঋণকৃত তহবিলের মাধ্যমে ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকেন। কাজেই এখান থেকেই বুঝা যায় আমাদের ব্যবসায়ীদের মূলধন সরবসাহের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। সারণী - ৫(৯)

বাংলাদেশী সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরামর্শ

বাংলাদেশের সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা অনেক রকমের পরামর্শ দিয়েছেন, ২০% জনের মতে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে, ২০% জনের মতে বস্ত্রের নায্যমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ২০% জনের মতে বস্ত্রের ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে হবে, ২০% মতে বস্ত্রের মান উন্নয়ন করতে হবে বাকী ২০% জনের মত হলো সিল্ক বস্ত্র আদানী নিষিদ্ধ করতে হবে। সুতরাং উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন আমাদের সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। সারণী -৫(১০)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অ-তুঁত রেশম

Dhaka University Institutional Repository

অ-তুঁত রেশমঃ

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবর্তন হচ্ছে জীবন যাত্রার ষ্টাইল বা ধারা। জীবন যাত্রার ধারা পরিবর্তনের সাথে সৌখিন বস্ত্রের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। আর এই সৌখিন বস্ত্রের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রাকৃতিক সিল্কের বিকল্প নেই। উন্নত বিশ্বে প্রাকৃতিক সিল্কের চাহিদা পূরনের জন্য তুঁত চাষের মাধ্যমে রেশম উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সিল্ক উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে এই সিল্কের উৎপাদনের পরিমান মোট উৎপাদনের মাত্র ৫%। তুঁত ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে যে প্রাকৃতিক সিল্ক উৎপাদন করা হচ্ছে তাদের নামকরণ করা হয়েছে অ-তুঁত সিল্ক (Non Mulberry silk) এই সিল্কগুলিকে বন্য সিল্কও বলা হয় কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে এই সমস্ত সিল্ক কীটগুলি বনে জঙ্গলে বেড়ে উঠা উদ্ভিদের লতাপাতা খেয়ে বেড়ে উঠে এবং আধিকাংশ সময় বনে বাস করে ও গুটি উৎপাদন করে। এই অ-তুঁত সিল্ক প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ তসর, এরি ও মুগা। এই তিন প্রকার অ-তুঁত রেশমের মোট উৎপাদনের পঁচানব্বই ভাগই হল তসর। অ-তুঁত রেশম উৎপাদনে ভারত ও চীন সবার উর্ধ্বে অবস্থান করছে। আমাদের দেশে অ-তুঁত রেশমের মধ্যে এরি রেশমের প্রচলন দেখা যায়। তাই আমি এরি রেশম উৎপাদনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং অন্য দুই প্রকার অ-তুঁত রেশম উৎপাদন সম্পর্কে সাধারন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে আমার গবেষণার মূল বিষয় হল তুঁত রেশম এবং তথ্য সংগ্রহের মূলক্ষেত্র হল চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট থানা যেখানে কোন প্রকার অ-তুঁত রেশম চাষ হয় না। সেজন্য আমি অ-তুঁত রেশম চাষের আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের তথ্যের উপর নির্ভর করেছি।

৫.১ এরি চাষঃ

আমাদের দেশে অ-তুঁত রেশম চাষের ক্ষেত্রে এরি রেশম চাষ করা হয়। অন্য দুই প্রকার অ-তুঁত রেশমের চাষ করা হয় না। তাই এরি চাষ সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হল। পৃথিবীর ৯৫% প্রাকৃতিক রেশম তুঁত গাছের পাতা খেকো রেশম কীট থেকে উৎপাদিত হয় এবং তুঁত গাছের পাতার সাহায্যে রেশম কীটের লালন ও গুটির উৎপাদনকে

Dhaka University Institutional Repository

রেশম চাষ বলে থাকি। অন্যান্য উদ্ভিদের সাহায্যে রেশম কীট পালন ও গুটি উৎপাদনকে রেশম কীটের আপ্যায়নকারী উদ্ভিদের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। অতএব, এরি চাষ বলতে আমরা এরি গাছের (যাকে আমরা ভেরেন্ডা নামে জানি) উৎপাদন এবং এরি রেশম কীটের লালন-পালনের মধ্য দিয়ে গুটি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বুঝি। এরূপ গুটি থেকে উৎপাদিত সূতাকে এরি সিল্ক বা এরি রেশম বলা হয় এবং উৎপাদিত বস্ত্রকে এরি রেশম বস্ত্র বা এরি সিল্ক বস্ত্র বলা হয়।

'এরি' কথাটি আসামী ভাষা 'এরা' থেকে এসেছে। আসামে ক্যাস্টোর তেলের গাছকে এরা বলা হয়। মূলতঃ এই ক্যাস্টোর গাছের পাতা খেয়ে এরি রেশম কীট জীবন ধারণ করে। ক্যাস্টোর গাছের পাতা ছাড়াও অন্যান্য গাছের পাতা এরি রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরি চাষের ইতিহাস অস্পষ্ট। তবে অনেকের ধারণা ভারত থেকে এরি চাষের সূচনা হয়েছে। এই ধারণার পিছনে যুক্তি হল পৃথিবীর অধিকাংশ এরি উৎপাদিত অঞ্চল ভারতেই অবস্থিত। কীটবিদদের মতে এরি রেশম কীটের আদি উৎপত্তি স্থান হচ্ছে ভারতের ব্রহ্মপুত্র বিধৌত আসাম রাজ্যে এবং বহু প্রাচীন কালে আসামে এরি সিল্কের কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল যা আজও আসামে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় এরি চাষ করা হয়। তবে মানিকগঞ্জ জেলায় এরি চাষের প্রচলন বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

এরি গাছের পাতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে এরি সিল্ক বস্ত্র উৎপাদন পর্যন্ত কার্যাবলীকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-এরি পাতা সংগ্রহ বা উৎপাদন, এরিকীট পালনের মধ্যে দিয়ে গুটি উৎপাদন, গুটি থেকে সূতা আহরণ এবং বস্ত্র বয়ন, এই চারটি কাজের প্রত্যেকটিতে রয়েছে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ।

এরিকীট পালনের জন্য অনেক রকম গাছের পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ক্যাস্টোর বা এরি গাছের পাতাই সবচেয়ে উপযুক্ত। ক্যাস্টোর বা এরি ছাড়া যে সমস্ত গাছের পাতা ব্যবহার করা যেতে পারে তা হচ্ছে-গুরুত্বের ক্রমানুসারে কেশেরসি, (Kesserce) পেয়াম (Payam) এবং টেপিওকা বা ক্যাসাভা (Tapoca Or Casava)। বাংলাদেশে ক্যাস্টোর ও টেপিওকা পাতা এরি কীট পালনের জন্য ব্যবহার করা হয়। অতএব, আমি ঐ দুই প্রকার উদ্ভিদের কথা আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারনতঃ সংগঠিত ভাবে ক্যাস্টোর চাষ করা হয় না। ক্যাস্টোর প্রাকৃতিক উপায়ে বংশ বিস্তার করে। একজন এরি কীট পালন কারী তার বসতবাড়ীর আশেপাশে থেকে এরি পাতা সংগ্রহ করে-এরি কীট পালন করতে পারে। উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না, ক্যাস্টোর গাছ জন্মানোর উপযুক্ত স্থান। যে কোন ধরণের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া এই গাছের জন্য উপযুক্ত। ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যেই একটি ক্যাস্টোর গাছ পাতা উৎপাদন করতে পারে। একটি পুর্ণাঙ্গ গাছ ৫ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসর ৭৫ থেকে ১০০ কেজি পর্যন্ত পাতা উৎপাদন করতে পারে।[১] এক একর জমিতে ক্যাস্টোর চাষ করে প্রতি বৎসর ৩০০ কেজি বীজ এবং ৭০০০ কেজি পাতা উৎপাদন করা যায়।[২]

ক্যাস্টোর গাছের পাতা এরিকীটের খাদ্য হিসেবে, বীজ ভোজ্য তৈল হিসেবে এবং কাণ্ড জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই গাছ থেকে এক সাথে তন্তু (Fibre) খাদ্য ((Food) এবং জ্বালানী (Fuel) পাওয়া যায়। এজন্য এর নাম দেয়া হয়েছে 3F. অর্থাৎ Fibre, Food, and Fuel.

বাণিজ্যিক ভাবে এরি চাষের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ক্যাস্টোর গাছের উপর নির্ভর না করে ক্যাস্টোরের চাষ করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ভাবে ক্যাস্টোর চাষের মাধ্যমে একই সাথে ক্যাস্টোর পাতা, ক্যাস্টোর তৈল বীজ ও জ্বালানী পাওয়া যায়। ক্যাস্টোর গাছের পাতা তোলার কারণে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, ফুল আসতে দেরী হয় এবং তৈল বীজের পরিমান ৫০% হ্রাস পায়। তবে বর্তমানে এক সমীক্ষায় জানা গেছে ২৫% পাতা তোলা হলে গাছের বৃদ্ধি ও তৈরী বীজ উৎপাদনের পরিমান বাধাগ্রস্ত হয় না।[৩] বার্ষিক অথবা বহু বার্ষিক পদ্ধতিতে ক্যাস্টোর চাষ করা যেতে পারে। বার্ষিক পদ্ধতিতে ক্যাস্টোর চাষ করলে এক বৎসরের মধ্যে যাবতীয় কার্যকলাপ শেষ করা হয়। বহু বার্ষিক পদ্ধতিতে ক্যাস্টোর চাষ করলে প্রথম বর্ষ ছাড়াও আরও কয়েক বৎসর ধরে ফলাফল উপভোগ করা যেতে পারে। বহু রকমের ক্যাস্টোর গাছ আছে। এদের মধ্যে গোলাপী রংয়ের ক্যাস্টোর গাছ এরিচাষের জন্য উপযুক্ত নয়। যে সমস্ত ক্যাস্টোরের পাতা পাউডার মুক্ত, বড় আকৃতির সে সমস্ত পাতা এরি চাষের জন্য উপযুক্ত। এ ছাড়াও যে সমস্ত ক্যাস্টোর গাছে ঘন ঘন কুশী আসে এবং ঘন ঘন লতি থাকে সে সমস্ত গাছ এরি কীট পালনের জন্য উপযুক্ত।

---

১. Sericulture Industry in Bangladesh: Analysis of Production Performance, Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS 1989, Page. 134

২. Silk Sector in Bangladesh : A Selective Review, Prepaired for BSB, Rajshahi, Prepaered by M.A. Hamid R.U. 1989, Page-180

৩. Silk Sector in Bangladesh : A Selective Review, Prepaired for BSB, Rajshahi, Prepaered by M.A. Hamid RU 1989, Page-180

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এরি কীট পালনের জন্য টেপিওকা ব্যবহার করা হত। টেপিওকা একটি গ্রীষ্মকালীন উদ্ভিদ। টেপিওকা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মায়। তবে টেপিওকা স্যাঁতসেতে ও পানি জমে থাকা জমিতে ভাল জন্মায় না। বালুকাময় মৃত্তিকা টেপিওকা চাষের জন্য বেশী উপযুক্ত। টেপিওকার মূল গ্রীষ্মমন্ডলীয় অধিবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য। এর খাদ্যমূল্য অনেক বেশী। এক একর জমিতে টেপিওকা চাষ করে বৎসরে ৫-৬ টন পর্যন্ত টেপিওকা মূল উৎপাদন করা সম্ভব। অনেক রকম টেপিওকার মধ্যে সবুজ জাতীয় টেপিওকার পাতা এরি কীট চাষের জন্য বেশী উপযুক্ত। বৎসরে ২বার টেপিওকা পাতা সংগ্রহ করা যায়। একবার বৎসরের মাঝামাঝি সময় আর একবার বৎসরান্তে মূল সংগ্রহের সময়।

এরি চাষের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এরি কীটের লালন পালনের মধ্যে দিয়ে এরিগুটি উৎপাদন। এরি কীট পালনের প্রক্রিয়াটি মোটামুটি তুঁত রেশম কীট পালনের মতই তবে অতটা জটিল নয় এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। এক কথায় এরি কীট চাষ রেশম কীট চাষ অপেক্ষা সহজ। বিশ্বাস করা হয় ভারতের আসাম প্রদেশই হলো এরি কীটের আদি বাসস্থান। কারণ স্বরূপ বলা যায় এই কীটের সূতার উপর ভিত্তি করে বহু আগে এখানে এরি বস্ত্রের কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল।

অ-তুঁত জাতীয় রেশম কীটের মধ্যে এরি কীটই একমাত্র কীট যা সম্পূর্ণরূপে গৃহ পালিত এবং বহুচক্রী যা সারা বৎসর ধরে পালন করা যায়। এরি কীট নিম্ন সমতল ভূমি থেকে শুরু করে ৫০০০ ফুট উচু ভূমিতেও পালন করা যায়। এরি কীট পালনের জন্য ২৪-২৮° তাপমাত্রায় ৮৫-৯০ শতাংশ আর্দ্রতা প্রয়োজন। এরি কীট উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, এরি কীটের বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুঁত কীট ও তসর কীটের চেয়ে বেশী।

উচ্চ ফলনশীল (HYV) এরি কীট সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ সমস্ত এরি কীটের বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেক। তবে এরি কীটের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেমন লার্ভাল সময় সংক্ষিপ্ত করণ, গুটির ওজন বৃদ্ধিকরণ, মজবুত খোলস ও পূর্ণ আঁশ সম্পন্ন গুটি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা হয়নি, যা তুঁত রেশম কীটের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এরি কীটের বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যের অভাব পূরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ বংশগতি রদ বদল করে এরি কীটের মধ্যে বাণজ্যিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

এরি কীটের জীবন চক্র মোট চারটি ধাপের সমন্বয়ে গঠিত যেমন - ডিম, লার্ভা, পুপা ও মথ। প্রাকৃতিক নিয়মে ডিম উৎপাদন হয়, উৎপাদিত ডিম থেকে এরিকীটের জন্ম হয়, জন্ম সময় হতে পুপা নাম হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে লার্ভাল সময় বলা হয় এবং এরি কীটের এই অবস্থাকে বলা হয় লার্ভা। এই লার্ভাল সময়ে এরিকীটকে প্রচুর পরিমানে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। লার্ভাল সময় শেষে এরি কীটকে বলা হয় পাকা পলু। এই পাকা পলু অবস্থায় এরি কীট গুটি তৈরী করে। এরপর পুপা অবস্থায় এরি কীট গুটির মধ্যে অবস্থান করে। পুপা অবস্থা শেষে এরি কীট পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণাঙ্গ রূপকে বলা হয় মথ। মথ গুটি ছিদ্র করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং অল্প সময়কালের মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়া শেষ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। গ্রীষ্মকালে ৪৪ দিনে এবং শীত কালে ৮৫ দিনে এরি কীটের জীবন চক্র শেষ হয়। নীচে এরি কীটের জীবন চক্রের বিভিন্ন স্তরে, প্রয়োজনীয় সময় সীমা দেখানো হলো।

সারণী ঃ ৫.১

এরি কীটের জীবন চক্র

স্তর	প্রয়োজনীয় সময়সীমা (দিন)	
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
ডিম	৯	১৫
লার্ভাল	১৭	৪৫
স্পিনিং	৩	৫
পুপা	১৩	১৮
মথ	২	৩

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাতা প্রাপ্তির সাপেক্ষে বৎসরে ছয়বার পর্যন্ত এরি গুটি উৎপাদন করা যেতে পারে।৪

---

৪. The Silk Sector in Bangladesh : A Selective Review : Prepared For BSB, Rajshahi, Prepared by M.A. Hamid R.U. 1989, Page - 181

Dhaka University Institutional Repository

এরি চাষ ও শিল্পের তৃতীয় ধাপ হচ্ছে এরি গুটি থেকে সূতা প্রস্তুত। এরিগুটির মুখ খোলা থাকার জন্য এবং আঁশ সবিরাম (Discontinuous) হওয়ায় স্পিনিং পদ্ধতিতে সূতা আহরণ করা হয়। সূতা উৎপাদন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। সূতা উৎপাদনে সনাতন পদ্ধতি যথা- টাকি ও চরকা ব্যবহার করা হয়। সূতার পুরুত্ব (Thickness) সমান হয় না এবং উৎপাদনের পরিমান ও অনেক কম। একটি এরি গুটি থেকে ৪০ কাউন্টের ১৩ থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত সূতা উৎপাদন হয়।[৫] এই মাপ সূতার পুরুত্বের উপর নির্ভর করে। সূতার পুরুত্ব (চিকন অথবা মোটা) হওয়াটা কারিগরের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক কথায় দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করায় সূতা অমসৃণ ও পুরু হয়।

বাংলাদেশের রেশম গবেষণা ও ট্রেনিং সংস্থা (BSRTI) এক ধরনের উন্নত মানের সূতা কাটা চরকা আবিষ্কার করেছে।[৬] এই মেশিনে স্বয়ংক্রিয় ট্রেভার্স গতি (Traverse Motion) স্থাপন করা হয়েছে। এ মেশিনের সুবিধা এই যে, অবিরাম গতিতে ববিন ঘোরার ফলে সূতা মসৃণ ও সমান পুরুত্বের হয়, উৎপাদনের পরিমান বেড়ে যায় এবং উৎপাদন সময় কমে যায়।

এরিচাষ ও শিল্পের শেষ ধাপ হল বস্ত্র বয়ণ বা কাপড় তৈরী। সূতা অমসৃন ও পুরু হওয়ায় তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন করা হয়। বৃহদাকারে বস্ত্র বয়নের কোন কারখানা নেই। বস্ত্র বয়ন কুটির শিল্প হিসাবে পরিচালিত হয়। সাধারণত এরি রেশম দ্বারা শাল (গায়ের চাদর) স্কার্ফ,পাঞ্জাবী ও পর্দার কাপড় ইত্যাদি তৈরী করা হয়। অতীত ঐতিহ্যের ধারক মনে করে অনেক বিত্তবান ব্যক্তি এরি সিল্কের কাপড় ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশের তুঁত রেশম চাষ ও তুঁত রেশম শিল্প মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই রেশম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এরি চাষ এরি রেশম শিল্প বিক্ষিপ্ত ভাবে সীমিত এলাকায় গড়ে উঠেছে ফলে তথ্যসংগ্রহ বা পাওয়া কঠিন।

১৯৮০ সালের পূর্বে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প সংস্থা ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এরি চাষ ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করত। তার পর থেকে বাংলাদেশ

---

৫. Sericulture Industry in Bangladesh :Analysis of Production Performance. Constraints and Growth Potentials, Zaid Bakht and others, BIDS 1988, Page - 135

৬. The silk Sector In Bangladesh : A Selective Review Prepaired for BSB, Prepaired by M.A. Hamid, R.U. Page. - 182

Dhaka University Institutional Repository

রেশম বোর্ড শুধু এরি কীটের বংশ রক্ষা (Mother Stock) ছাড়া অন্য তেমন কোন কাজ করে না। কতিপয় দেশী ও বিদেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভূমিহীন দরিদ্র, বেকার, মহিলা জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ সুগম করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ দান, ডি.এফ.এল. (DFL) বিতরণ, প্রশিক্ষণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ইত্যাদি। এরি বস্ত্রের বাজারজাত করণের ব্যাপারে এ সমস্ত এনজিও কাজ করে থাকে।

এরি চাষ তথা এরি শিল্পর বিকাশের পথে এরি কীটের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কতগুলি অসুবিধা রয়েছে-যেমন-এরি কীটের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশী এবং এরি পলু পালনে অনেক বেশী প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন, বিশেষ করে পলু পালনের শেষের দিকে। এ ছাড়া এরি কীটের মধ্যে অনেকগুলি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে যেমন-গুটির ওজন হালকা, অমজবুত খোলশ, সবিরাম আঁশ ও দীর্ঘকালীন লার্ভাল সময়। এ সমস্ত অসুবিধাগুলির কারণে জনগণ বাণিজ্যিক ভাবে এরিচাষ তথা এরি শিল্পের কাজে তত আগ্রহী নয়। ফলে বাংলাদেশে এরি শিল্প কুটির শিল্প হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এরি কীটের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অসুবিধাগুলি ছাড়াও কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে যেমন - প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা অভাব, উৎপাদনকারীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি, এরি চাষ সম্বন্ধীয় আধুনিক জ্ঞানের অভাব, প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

এরি কীটের চাষ তথা এরি শিল্পের বিকাশের যেমন কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। তেমনিই কতকগুলি সুবিধা এবং সম্ভাবনাও রয়েছে। এরিকীট চাষের জন্য এরিকীটের কতকগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুবিধা রয়েছে যেমন-এরিকীটের বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশী, গ্রীষ্মমন্ডলীয় যে কোন প্রকার আবহাওয়া এরি চাষের উপযুক্ত, এরিকীটের ডিম চাষীরা নিজেই উৎপাদন করতে পারে এবং এরি কীটের খাদ্য প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত এরি গাছ থেকে সংগ্রহ করা যায় ইত্যাদি। এরি কীট গৃহপালিত হওয়ায় এরিকীট পালনকারী পরিবারের সকল সদস্যই এ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এরিচাষ তথা এরি শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বিপুল পরিমান বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এরিচাষ তথা এরি শিল্পের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমান খুব সামান্য এবং অতি অত্যাধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না। দেশে ও বিদেশে এরি রেশম বস্ত্রের বাজার রয়েছে। এই শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। এরিচাষ তথা এরি শিল্পের সুবিধা ও সম্ভাবনাসমূহ বিবেচনা করে এবং এর অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশে এরিচাষ ও এরি রেশম শিল্পের বিকাশের জন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) এরি রেশম শিল্প সম্প্রসাণের জন্য একটি সঠিক জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

(২) বর্তমানে এরি চাষ তথা এরি শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে কোন ধরণের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার সমর্থন দেয়ার ব্যবস্থা নাই। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (BSB) এরিচাষের ক্ষেত্রে তেমন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে DFL সরবরাহ না করলে যে কোন সময় চাষীরা পলুর মড়ক থেকে মারাত্মক ধরণের ফসল হানির সম্মুখীন হতে পারে যে অবস্থা মোটেই কাম্য নয়। সে জন্য কমপক্ষে ১টি আধুনিক বীজাগার নির্মান করা দরকার। এ ছাড়া সরকারী, আধা সরকারী এবং দেশী ও বিদেশী সংগঠনগুলির সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো উচিত।

(৩) জনগণের মধ্যে এরি চাষ, এরি রেশম বস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে এরি শিল্পের উন্নয়নকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৫) সরকার ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত ক্যাস্টোর পাতার উপর নির্ভর না করে ক্যাস্টোর এবং টেপিওকার চাষ বাড়াতে হবে। ক্যাস্টোর বীজ এবং টেপিওকা মূল ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ফলে ক্যাস্টোর ও টেপিওকা চাষ লাভজনক হবে।

(৭) এরিকীটের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটাতে হবে।

(৮) এরিগুটি থেকে উন্নত মানের এবং বেশী পরিমান সুতা পাওয়ার লক্ষ্যে স্পিনিং পদ্ধতির উন্নয়ন করতে হবে।

(৯) এরি রেশম বস্ত্রের বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) তুঁত রেশমের পাশাপাশি এরি রেশম উন্নয়নের জন্য গবেষণা করতে হবে। গবেষণা কাজের জন্য বর্তমান গবেষণা কেন্দ্র BSRTI টিতে আলাদা গবেষণা সেল খোলা যেতে পারে।

(১১) পার্বত্য চট্টগ্রামের অব্যবহৃত পাহাড়ী জমিতে জুম চাষের পাশাপাশি এরি চাষকে জনপ্রিয় করার মাধ্যমে পাহাড়ী জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(১২) আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এরি শিল্পে অনেক অগ্রসর লাভ করেছে। ভারত থেকে এরি চাষের নতুন নতুন প্রযুক্তি আনা যেতে পারে। এরি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ভারতে ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে বাংলাদেশের এরিচাষ তথা এরি শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব হবে। এরি রেশম শিল্প প্রসারের মধ্য দিয়ে বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান হবে এবং আয়ের পথ সুগম হবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে এরি রেশম কুটির শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি এরি রেশম শিল্পের উদ্ভব হতে পারে।

৫.২ তসর চাষঃ

বাংলাদেশে তসর সিল্কের কোন উৎপাদন হয় না। বাংলাদেশে তসর সিল্ক উৎপাদন কতখানি লাভজনক খতিয়ে দেখার জন্য তসর সিল্ক চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত প্রাকৃতিক সিল্ক বস্ত্রের ৯৫% হল তুঁত রেশমের দ্বারা তৈরী এবং বাকী ৫% হল অ-তুঁত রেশম দ্বারা তৈরী। আবার এই অ-তুঁত রেশমের ৯৫% হল তসর। প্রাকৃতিক রেশম বস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষেত্রে তসরের অবস্থান সহজেই অনুমেয়। সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে সিল্ক বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। এই বর্দ্ধিত চাহিদা পুরণ করা একা তুঁত রেশমের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তসরের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত ও চীন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ভারত তসরের উন্নয়নের জন্য রাঁচিতে তসর রিসার্চ ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নামে একটি সংস্থা স্থাপন করছে। এই সংস্থা তসর চাষের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা অনুকরণীয়। প্রথমে আমি তসর চাষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। এরপরে ভারতের রাঁচিত উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব। সবশেষে বাংলাদেশে তসর চাষের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

তসর চাষ কি জানলে ভাল হয়। তসর হল তুঁত সিল্কের ন্যায় এক ধরণের প্রাকৃতিক সিল্ক। তসর সিল্ক যে সমস্ত কীটের প্রোটিন থেকে তৈরী হয় তাকে বলা হয় তসর সিল্ক কীট বা তসর কীট। এসব কীট যে সমস্ত উদ্ভিদের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে বল হয় তসর খাদ্য উদ্ভিদ (Tasar Host plants)। তসর খাদ্য উদ্ভিদের উৎপাদন এবং তসর কীটের লালন পালনের মধ্যদিয়ে গুটি উৎপাদনকে বলা হয় তসর চাষ।

তসর কীট হলো পলি ফাংগাস জাতীয় পতঙ্গ। তথাপিও দেখা গেছে কতকগুলি উদ্ভিদ তুলনা মূলকভাবে ভাল গুটি উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। তসর কীটের খাদ্য তালিকায় যে সমস্ত উদ্ভিদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ হচ্ছে ৮টি-আসান, অর্জুন, শাল, সিদ্ধ, জারুল, শাওনী, বড়ই বা কুল, অঞ্জন এবং অর্জুন।[৭] এ ছাড়াও দ্বিতীয় সারির দুই ডজনের উপরে তসর খাদ্য উদ্ভিদ রয়েছে।

সাধরনতঃ বীজ বপন পদ্ধতিতে তসর খাদ্য উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করা হয় যেহেতু এ সমস্ত উদ্ভিদ নিস্কামভাবে (Asexully) বংশ বিস্তার করতে পারে না। যাহোক কাটা, দাবা কলম, কলম এবং মুকলিত (Cutting layering, Grafting and budding) পদ্ধতির মধ্যমে কতিপয় তসর খাদ্য উদ্ভিদের নিস্কাম (asexual) বংশ বিস্তার, সফলতার সাথে অর্জন করা হয়েছে। তসর খাদ্য বৃক্ষ সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় ভাল জন্মায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা প্রাকৃতিক উপায়ে বেড়ে উঠে। এ সমস্ত উদ্ভিদের জন্য সার ও সেচের প্রয়োজন পড়ে না।

তসর কীট হলো আধা গৃহ পালিত পতঙ্গ। এরা লার্ভাল সময় বাড়ীর বাহিরে বন জঙ্গলে অতিবাহিত করে। তসর কীট তুঁত কীটের মত নয় । এদের বন-জঙ্গলের বিভিন্ন ধরণের আবহাওয়ার সখ্যতা আছে বিধায় এরা অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। তসর কীটের লার্ভাল সময় সীমা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে ৩০-৭০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। অ্যানথারিয়া মাইলিট্টা (Antharaea Myletta) প্রজাতির তসর কীটের লার্ভাল সময় সীমা বৎসরের কোন সময় চাষ করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম হতে পারে যথা - প্রথম ফসল ৩০ - ৩৫ দিন (জুলাই-আগষ্ট), দ্বিতীয় ফসল ৪০-৪৫ দিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং তৃতীয় ফসল ৬০-৭০ দিন (নভেম্বর-জানুয়ারী)। তসর কীট পালনের জন্য কোন প্রকার আধুনিক সরঞ্জামাদী প্রয়োজন পরে না। এতক্ষণ আমরা জানতে পারলাম তসর খাদ্য উদ্ভিদ এবং তসর কীটের সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যসমূহ।

---

৭. Silk Sector In Bangladesh : A Selective Review Prepaired for BSB, Rajshahi, Prepaired by M.A. Hamid, R.U. Page. - 183

Dhaka University Institutional Repository

এখন আমরা জানতে পারব ভারতের রাঁচি তসর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তসর খাদ্য উদ্ভিদের অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং সেই সাথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ভারতের রাঁচি তসর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট একটি পর্যবেক্ষণ দ্বারা, তসর খাদ্য উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করা যায় না, এই প্রচলিত ধারণাকে নাকোচ করে দিয়েছে। তসর চাষের ক্ষেত্রে এখন ভারত অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। ভারতে তসর চাষকে অর্থকরি ফসলের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই নতুন ধারার ফসল হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে তসর খাদ্য উদ্ভিদের চাষ। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ৪×৪ চারা রোপণ এবং ৪ উচ্চতায় ডগা ছেটে ফেলা অর্থনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় কাম্য। এভাবে গাছ লাগানোর ফলে এক গাছের শাখা প্রশাখা অন্য গাছের শাখা প্রশাখার উপরে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে ঝোপের সৃষ্টি হবে এবং সেই ঝোপে তসর কীট পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে তসর কীট পালন করলে তসর কীটের স্থানান্তর কমে যায় এবং পরিদর্শন কাজ সহজ হয়। এই অর্থনৈতিক তসর খাদ্য উদ্ভিদ চাষ পদ্ধতিতে প্রতি DFL থেকে ৭০ - ৮০ টি গুটি উৎপাদন করা যায় কারণ এখানে কীটের মৃত্যুর হার কমে যায়। এক হেক্টর জমিতে অর্থনৈতিক তসর খাদ্য উদ্ভিদ লাগিয়ে ৪০০- ৫০০ পর্যন্ত ডিম এর শাবক দল (broods of eggs)-পালন করে ২২ কাহন পর্যন্ত গুটি উৎপাদন করা যায়। ১ কাহন সমান হল ১২৮০ টি গুটি।[৮]

এখন আলোচনা করব বাংলাদেশে তসর চাষের যৌক্তিকতা। বাংলাদেশে তসর চাষ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত কারণ এই যে ঃ-

(১) আমাদের আবহাওয়া ভারতের ন্যায়। ভারতের তসর চাষ সম্ভব হলে বাংলাদেশে কেন হবে না।

(২) তসর চাষের জন্য প্রচুর মানব শক্তি প্রয়োজন। আমাদের মানব শক্তি কোন কমতি নাই।

(৩) তসর কীট পালনের জন্য কোন প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন পরে না।

(৪) তসর খাদ্য উদ্ভিদ উৎপাদন কোন রকম সার বা সেচের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া আমাদের বর্তমান বনভূমির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে তসর খাদ্য গাছ। যেমন-শাল, অর্জুন , জারুল, বড়ই ইত্যাদি।

---

৮. ভারতের রাচির তসর সিল্ক এন্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহের উৎসঃ Silk Sector In Bangladesh : A Selective Review Prepaired for BSB, Prepaired by M.A. Hamid. R.U. Page. - 185

Dhaka University Institutional Repository

(৫) তসর চাষ তিনদিক থেকে লাভবান যথাঃ (ক) গুটি উৎপাদন, (খ) জ্বালানি উৎপাদন এবং (গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা।

(৬) তুঁত রেশম চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ব্যয়ের ৬০% তুঁত গাছ উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যায় হয়।[৯] তাছাড়া তুঁত পোকা পালনের জন্য চালা ঘর নির্মাণ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির জন্য প্রাথমিক ভাবে অনেক খরচ করতে হয়। তেমনিভাবে অ-তুঁত রেশম কীটের মধ্যে এরিকীট গৃহপালিত হওয়ায় এরিচাষের প্রাথমিক ব্যয় বেশী। পক্ষান্তরে তসরকীট এবং মুগাকীট আধা গৃহপালিত হওয়ায় এদের চাষের জন্য প্রাথমিক ব্যয় কম।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি বাংলাদেশে তসর চাষ, প্রচুর মানব শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদে বিভূষিত বাংলাদেশের আর্থিক ভাবে নিষ্পেষিত জন গোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করবে।

আমাদের দেশে তসর চাষের কোন প্রচলন নেই। বাংলাদেশে তসর চাষ শুরু করতে হলে আমাদের যা করতে হবে তা হলো-

বাংলাদেশের বন বিভাগের সহায়তায় একটি সুষ্ঠু জরিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের বনভূমিতে অবস্থিত তসর খাদ্য উদ্ভিদের অনুসন্ধান করতে হবে। সুষ্ঠু পন্থায় তসর খাদ্য উদ্ভিদ উৎপাদন এবং রক্ষনাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন বিভাগকে তসর চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে বন বিভাগের অতিরিক্ত আয়ের পথ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপ ভাবে বাংলাদেশের বনভূমিতে অবস্থিত বন কর্মচারী ও জনগোষ্ঠিকে তসর চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সিল্ক রিসার্চ এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে তসর কীট পালন শুরু করতে হবে। ক্রমান্বয়ে এর বিস্তার ঘটাতে হবে। ভারত এবং চীন হতে বিভিন্ন ধরণের উন্নত মানের তসর কীট আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের রাঁচি তসর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক তসর খাদ্য উদ্ভিদ উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করে তসর খাদ্য উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

৯. Silk Sector In Bangladesh : A Selective Review Prepaired for BSB, Prepaired by M.A. Hamid, R.U. Page. - 265

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে তসর চাষকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে সামাজিক বনায়নে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত হবে এবং গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ভাল হবে। তুঁত রেশম চাষের অভিজ্ঞতাকে তসর চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে। তসর চাষে আগ্রহী চাষীদের দেশে ও বিদেশে ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

তসর চাষ সম্পর্কে শেষ কথা হলো এটি বাংলাদেশের জন্য হবে সম্পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক কার্য। যে কোন নতুন অর্থনৈতিক কার্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ব্যক্তিগত ভাবে করার সাহস অনেকেরই নেই। তাই সরকারকে তসর চাষের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একবার সফলতা অর্জন করতে পারলে তসর চাষ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

৫.৩ মুগা চাষঃ

অ-তুঁত রেশমের অন্যতম রেশম হ'ল মুগা রেশম। মুগা রেশম সোনালী হলুদ রেশম নামে সর্বাধিক পরিচিত। এই রেশম তার বাহারী রংয়ের কারণে অন্যান্য রেশম বস্ত্রের নকশার কাজেও ব্যবহার হয়ে থাকে। ভারতের মধ্যে আসামই একমাত্র প্রদেশ যাকে প্রকৃতি অ-তুঁত রেশম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও পতঙ্গে ঐশ্বর্য্যমন্ডিত করেছে। এরি ও তসর ছাড়াও আসামের রয়েছে মুগা চাষ ও শিল্পের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য এবং পৃথিবীর এক মাত্র মুগা রেশম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

বাংলাদেশের সিলেট জেলার মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার সাথে আমাদের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার অনেক মিল রয়েছে। সিলেটের পাহাড়ী ঢালে বিক্ষিপ্ত ভাবে অযত্নে ও অব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত মুগা রেশম কীটের খাদ্যগাছ দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী উপজাতীরা এই সমস্ত উদ্ভিদের উপযোগিতা না বুঝে অবাধে ধ্বংস করে ফেলছে। আমাদের রেশম সুতা উৎপাদন কারীরা অনেকে সিলেটের পাহাড়ী বনাঞ্চল থেকে বনজ মুগাগুটি সংগ্রহ করে থাকে; যা আমাদের দেশের সিলেট জেলায় মুগা কীটের উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।

পলি ফাংগাশ (Ploy Phangous) মুগা সিল্কের কীট সম (Michelins bomlycina) ও সোয়ালু উদ্ভিদের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রায় ৩০ ধরনের সম গাছ রয়েছে।[১০] পাতা চিবানো পরীক্ষা দ্বারা এদেরকে আলাদা করা যায়। এই সমস্ত উদ্ভিদের মধ্যে যাদের পাতা নরম কিন্তু স্বাদ জেলীর মত নয় মুগা কীট তাদেরকে বেশী পছন্দ করে।

---

১০. Silk Sector In Bangladesh : A selective Preview Prepaired for BSB. Prepaired by M.A. Hamid, R.U. Page. - 186

Dhaka University Institutional Repository

উভয় ধরনের খাদ্য উদ্ভিদ সাধরণতঃ বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। বীজ বপন পদ্ধতিতে চাষ করলে একটি নতুন মুগা গাছ থেকে কীট পালনের জন্য পাতা পেতে পাঁচ বছর সময় লাগে। সম্প্রতি একটি গবেষণার মাধ্যমে এয়ার লেয়ারিং (Air layering) দ্বারা সনের কলোনাল বংশ বিস্তার (Colonal Propagation) পদ্ধতির উদ্ভব করা হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতিতে সম চাষ করলে কীট পালনের জন্য পাতা পেতে সময় লাগে ৩ বছর। মুগা খাদ্য উদ্ভিদের ডগা সাধরণতঃ ছেটে ফেলা হয় না তবে মুগা সিল্ক কীট পালনের সুবিধার্থে চারা লাগানোর সময় চারার মূল শিকর ছেঁটে দেয়া (Clipping) হয় যাতে করে গাছ ঝাকরা ভাবে বেড়ে উঠে।

মুগা সিল্ক কীট বহু চক্রী (Polivoltine) প্রকৃতির সারা বৎসর ধরে ৫-৬ বার পর্যন্ত গুটি উৎপাদন করা যায়। তাপ মাত্রার উপর নির্ভর করে মুগা রেশম কীটের লার্ভাল সময় শীতকালে ৫০ - ৫৫ দিন, গ্রীস্মকালে ২৭-৩৩ দিন বর্ষাকালে ২২-৩১ দিন এবং শরৎকালে ২৬-৩২ দিন পর্যন্ত হতে পারে।[১১] এরা অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ৩৫°c উপরের তাপমাত্র তার সাথে ৬৫% এর নীচের আর্দ্রতায় মুগা কীট পলু অস্থির হয়ে পড়ে ফলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। প্রয়োজনীয় পরিমান পাতা খাওয়ার পর পলু গুটি তৈরীর লক্ষ্যে ভোরে খাদ্য গাছের গুড়িতে এসে দল বদ্ধভাবে জমায়েত হয়। এই সময়ে তাদেরকে সংগ্রহ করতে হয় নচেৎ এরা গুটি তৈরীর লক্ষ্যে দূরে সুবিধাজনক জায়গায় চলে যায়। বিকেলের দিকে গুটি তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ৩-৬ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আসামের ন্যায় সিলেটে রয়েছে। মুগা সিল্ক কীট ও মুগা সিল্ক কীটের খাদ্য গাছের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক আবাসভূমি। আসামের ন্যায় সিলেটও মুগা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় গুণে বিভূষিত। সিলেটে পাহাড়ী অঞ্চলে এখনও অনেক অনাবাদী পতিত জমি রয়েছে এবং রয়েছে বহু সংখ্যক বেকার পহাড়ী উপজাতি। সিলেট অঞ্চলে মুগা চাষ করলে এখানকার পাহাড়ী জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং মুগা চাষকে উপজাতীয় একটি সম্পূরক

---

১১. Silk Sector In Bangladesh : A Selective Review Prepaired for BSB, Prepaired by M.A. Hamid, R.U. Page. - 187

Dhaka University Institutional Repository

পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। মুগা চাষের ফলে পাহাড়ী অনুর্বর ও পতিত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভব হবে। সিলেটে মুগা চাষের সুবিধা ও সম্ভবনার কথা বিবেচনা করে এই অঞ্চলে নিঃসন্দেহে মুগা চাষ শুরু করা যেতে পারে।

অ-তুঁত রেশম চাষের সমগ্র আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক প্রকার অ-তুঁত চাষের নিজস্ব কতকগুলি সুবিধা ও সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে বহু পূর্ব থেকে এরি চাষের প্রচলন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নতুন কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। তসর চাষ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করতে হবে। তসর চাষের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে তসর চাষ শুরু করা অসম্ভব কিছু নয়। এক্ষেত্রে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা না থাকলেও তুঁত রেশম চাষের অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি। সিলেটে মুগা চাষ আরম্ভ করার যাবতীয় প্রাথমিক সুবিধা রয়েছে।

অতএব, বাংলাদেশের তুত রেশম চাষের পাশপাশি অ-তুঁত রেশম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অ-তুঁত রেশম চাষের মধ্য দিয়ে রেশম চাষের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। তুঁত রেশম চাষের পাশাপাশি অ-তুঁত রেশম চাষ আরম্ভ করলে বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠির নতুন কর্মসংস্থান হবে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা এবং উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা এবং উপসংহার

যদিও এক সময় বাংলাদেশকে রেশম ভান্ডার নামে আখ্যায়িত করা হত কিন্তু রেশম শিল্পের সেই সুদিন আর নেই। বাংলাদেশের রেশম শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই রেশম শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগন তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা এই শিল্পের মাধ্যমে তাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেয়েছিল। গ্রামের দরিদ্র জনগন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আমাদের এই শিল্পকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। বিভিন্ন ধরণের সমস্যার কারণে আজকে এই শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। কাজেই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা উচিত কি কি কারণে রেশম শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে এবং কারণগুলোকে নির্মূল করার জন্য সমাধান খুঁজে বের করা।

পুর্বেই রেশম শিল্পের পাঁচটি পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে রেশম শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্যা এবং সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেগুলো এখন আলোচনা করব। অর্থাৎ রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আমি নিম্ন লিখিত সুপারিশমালাগুলো পর্যায়ক্রমে প্রদান করছি।

৬.১ তুঁত চাষ সংক্রান্ত সুপারিশমালা

রেশম চাষের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তুঁত চাষ। কারণ তুঁত পাতার মানের উপরেই রেশম গুটির উৎপাদন নির্ভর করে। নিম্নে তুঁত চাষ সংক্রান্ত সমস্যা ও সুপারিশমালা প্রদান করা হলঃ-

(১) বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় পুরাতন পদ্ধতিতে স্থানীয় জাতের তুঁত চাষ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তুঁত চাষীদেরকে উন্নত জাতের তুঁত চারা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তুঁত চাষে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

(৩) আমাদের দেশে তুঁত চাষ সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে করা হয়। যথাঃ-ঝুপি পদ্ধতি, ঝাড় পদ্ধতি ও গাছ পদ্ধতি। তিনটি পদ্ধতির বিভিন্ন ধরণের সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে গাছ পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করাটাই আমাদের চাষীদের জন্য ভাল বলে আমি মনে করি। এজন্য তাদেরকে গাছ তুঁত চাষে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ গাছ পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করলে ফসলী জমির পরিবর্তে রাস্তার ধার, পুকুর ও নদীরপাড়, ফসলী জমির আইল ও বাড়ীর আঙ্গিনায়ও লাগান যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) আমাদের কৃষকদের অনেকেই দেখা যায় যে ভূমিহীন। যে সমস্ত তুঁত চাষী জমির অভাবে তুঁত চাষ করতে পারছে না তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে খাস জমি বিতরণ পরিকল্পনার আওতায় জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) যে সমস্ত এলাকায় বেশী পরিমানে তুঁত চাষ হচ্ছে সেখানে যাতে উৎপাদিত পাতা ব্যবহারের অভাবে নষ্ট না হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যেখানে বেশী তুঁত পাতা উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে তুঁত চাষের পাশাপাশি রেশম কীট পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে উৎপাদিত পাতার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হবে।

(৬) তুঁত চাষের জমিতে পর্যায়ক্রমিক ফসল চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষকদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে।

(৭) আমাদের কৃষকদের অধিকাংশই দেখা যায় দরিদ্র। অর্থের অভাবে তারা সঠিকভাবে তুঁত চাষ করতে পারে না। এজন্য তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

(৮) আমাদের কৃষকদের অনেকেই দেখা যায় সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমে তুঁত চাষ করে থাকে এবং তারা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞ। এই সমস্ত কৃষকদের তুঁত চাষের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৯) অনেক জায়গায় দেখা যায় অন্যায়ভাবে তুঁত গাছ উঠিয়ে অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করা হচ্ছে। এভাবে তুঁত গাছের যারা ক্ষতি করবে তাদের জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে।

(১০) তুঁত চাষের জমিতে যাতে যথাযথভাবে পানি সেচ করা হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও তুঁত গাছকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য সঠিকভাবে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বুশ ও লোকাট তুঁত চাষের ক্ষেত্রে যেহেতু পাতা পেতে দুই বছর সময়ের প্রয়োজন সে জন্য নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র চাষীদেরকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এবং VGF অথবা VGD কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়তা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) আমাদের দেশে যে বীজাগারগুলো আছে সেগুলোতে মান সম্পন্ন তুঁত পাতার ফলন বৃদ্ধি এবং উচ্চ ফলনশীল কাটিংস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় জাতগুলিকে উচ্চ ফলনশীল জাত দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করতে হবে। বছরের সব সময়ই এ কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

৬.২ পলু পালন ও রেশমগুটি উৎপাদন সংক্রান্ত সুপারিশমালাঃ

পলু পালন ও রেশম গুটি উৎপাদন রেশম শিল্পের দ্বিতীয় পর্যায়। পলু পালন ও রেশমগুটি উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ রেশমগুটির উৎপাদনের মান যত ভাল হবে রেশম সূতার মানও তত ভাল হবে। কাজেই অনেক যত্নের সাথে পলু বা গুটি পোকা পালন করতে হয় এবং রেশম গুটির মানের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। মীরগঞ্জ ও ভোলাহাট অঞ্চলে যে রেশমগুটি উৎপাদিত হয় সেখানেও অনেক অনিয়ম এবং অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে দেখা যায় যে রেশম শিল্পে উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমাদের রেশমগুটির মান তত উন্নত হয় না এবং উৎপাদনের পরিমান ও অনেক কম হয়। পলু পোকা পালন ও রেশমগুটি যথাযথভাবে উৎপাদনের জন্য নিম্নে সুপারিশমালাগুলো প্রদান করা হলঃ-

(১) রেশম পোকার পিতৃ মাতৃজাত সংরক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা রাখতে হবে। রেশম কীটের প্রজাতির বংশগত গুণ যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI)কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(২) উন্নত মানের রেশমগুটি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল রেশম কীট। এক্ষেত্রে বসনীদেরকে উচ্চ ফলনশীল জাতের রেশমকীট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল পলু পালন করার জন্য বসনীদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে BSRTI, বিএসএফ এবং অন্যান্য এনজিওগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

(৪) পলু পালনের জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে প্রথমের দিকে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। এজন্য এক্ষেত্রে ডিমের পরিবর্তে বসনীদের চাকী পলু সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। চাকী পলু পালন পদ্ধতির মাধ্যমেই উন্নত মানের রেশমগুটি উৎপাদন সম্ভব। পর্যায়ক্রমে এই প্রতিস্থাপনের কাজ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) উচ্চ ফলনশীল ডিম উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ জন্য প্রযুক্তি উন্নয়নের চেষ্টা চালাতে হবে। এ ব্যাপারে যারা ডিম উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে পলু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমানে উচ্চ ফলনশীল ডিম উৎপাদনের এ জন্য বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI) এর গবেষণার উপর আরও বেশী গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(৬) উন্নতমানের রেশম উৎপাদন যেহেতু উন্নতমানের ডিমের উপর নির্ভরশীল সেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে রেশম শিল্পে উন্নত দেশ সমূহ থেকে উচ্চ ফলনশীল ডিম আমদানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৭) আমাদের দেশে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকার রোগাক্রান্ত হয়ে অনেক পলু পোকা মারা যায়। যার ফলে রেশমগুটির উৎপাদনও অনেক কম হয়। বসনীদের এ সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষিতে রোগ নিরাময়ের ঔষধপত্র ও উজি মাছি নাশক তাদেরকে ভর্তূকী মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(৮) আমাদের গ্রামের দরিদ্র পলু পালনকারীরা দেখা যায় অনেক সময় অর্থের অভাবে পলু পালনের আনুষঙ্গিক জিনিস পত্র (ডালা চন্দ্রকী, পলু ঘর মেরামত) ক্রয় করতে পারে না। ফলে তারা সঠিকভাবে পলু পালনের কাজ করতে পারে না। তাই তাদেরকে এই সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ভর্তূকী মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) উচ্চ ফলনশীল পলু পালনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ পলু ঘর। অর্থাৎ আদর্শ পলু ঘর বলতে যে পলু ঘরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে বোঝান হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বসনীদের বেশীর ভাগই নিজেদের বসবাস করার ঘরেই পলু পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উচিত পলু পালনের জন্য পৃথকভাবে আদর্শ পলু ঘর নির্মাণ।

(১০) আমাদের দেশে বসনীদের রেশমগুটি শুকানো এবং সংরক্ষণের যথাযথ কোন ব্যবস্থা নাই। বিশেষ করে বর্ষার মৌসুমে আগুনে শুকাতে যেয়ে গুটি পুড়িয়ে ফেলে। এ জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ড্রায়ার। আমরা জানি BSRTI এ ধরণের ড্রায়ার উদ্ভাবন করেছে। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত ড্রায়ার বেশী পরিমানে তৈরীর ব্যবস্থা নিয়ে বসনীদের মাঝে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এছাড়া যেখানে বেশী পরিমানে গুটি উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে গুটি গুদামজাতকরণের আধুনিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) পলু পালনের বিভিন্ন সরঞ্জাম, ঔষধপত্র ক্রয়ে ভর্তূকী প্রদানের পরিবর্তে আমরা পলু পালনকারীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করতে পারি। এ ব্যাপারে সরকার ও অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

(১২) পলু পালনকারীরা সঠিকভাবে পলু পালন করছে কিনা রেশম শিল্পের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

(১৩) এ ছাড়া পলু পালনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত বই পুস্তক প্রকাশ ও তা বসনীদের মাঝে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(১৫) সর্বোপরি বলা যায় রেশমগুটি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে চরম অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য আমাদের দেশী রেশমের বাজার তৈরী করতে হলে কিছু দিনের জন্য রেশম বস্ত্র আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। এছাড়া আমদানীকৃত সূতার উপর বেশী পরিমানে কর আরোপ করতে হবে। এ ছাড়াও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে রেশম গুটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রয়েছে কোকোন মার্কেট। প্রয়োজনে আমাদেরকেও এ ধরণের কোকোন মার্কেট স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে বেশী পরিমানে রেশমগুটি উৎপাদিত হচ্ছে সেই সমস্ত এলাকায় রিলিং মেশিন স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই মেশিন যাতে তারা সহজে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৩ রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং সম্পর্কিত সুপারিশমালা ঃ

রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং হ'ল রেশম শিল্পের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে রেশমগুটি থেকে রেশম সূতা তৈরী করা হয়। রেশম সূতা তৈরীর ক্ষেত্রেও আমরা অনেক ধরণের সমস্যা দেখতে পাই। রেশম সূতা রিলিং ও স্পিনিং এর ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত সুপারিশমালা প্রদান করা হলঃ-

(১) উন্নত মানের রেশম সূতা তৈরীর জন্য প্রথম শর্ত হল পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নতমানের রেশমগুটির প্রাপ্যতা। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমানে রেশমগুটি উৎপাদিত হচ্ছে না এবং যাও হচ্ছে তার মান অনেক নিম্ন। কাজেই আমাদের প্রথমত: পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নতমানের রেশমগুটির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ভাল সূতা পেতে হলে রেশমগুটি ভালভাবে বাছাই, পর্যায়িতকরণ, শুকানো মোড়কীকরণ এবং গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। রেশমগুটি শুকানো ও গুদামজাতকরণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) সুতা রিলিং ও স্পিনিং আমাদের দেশে তিনটি পদ্ধতিতে করা হয়। যথা- চরকা, কাঠঘাই ও উন্নত রিলিং মেশিনে। চরকায় সাধারণত স্পান সূতা তৈরী হয়। এ পদ্ধতির ব্যবহার খুব কম। আমাদের দেশে বিশেষ করে ভোলাহাট অঞ্চলে কাঠঘাই এর মাধ্যমে সূতা তৈরীর প্রচলন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সুতার মান খুব একটা ভাল হয় না। উন্নত রিলিং মেশিনে সূতা অনেক ভাল হয় কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রচলন খুব কম এবং এটা অনেক ব্যয় বহুল। এক্ষত্রে কাঠঘাই মেশিন এর সাথে কিছু যন্ত্রাংশ যুক্ত করে আমরা সূতার মানটাকে ভাল করার চেষ্টা করতে পারি। এ ছাড়াও কোন কোন জায়গায় যেখানে বেশী রেশম গুটি উপাদিত হয় সেখানে উন্নত রিলিং মেশিন স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(৪) উন্নত মানের রেশম তৈরীর জন্য রিলারদের এ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা অনেক জরুরী। এ জন্য রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন - বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI), বিএসএফ ও অন্যান্য এন.জিও. দের এ সমস্ত রিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে রেশম সূতার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

(৫) রিলিং উপজাত থেকে চরকার মাধ্যমে যে স্পান রেশম সূতা পাওয়া যায় তা থেকে বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র, পাঞ্জাবী,চাদর, বেডকভার ইত্যাদি তৈরী করা যায়। কাজেই স্পান রেশম সূতা তৈরীর উপরেও জোর দিতে হবে। এরি রেশম, রেশম কীটের (এন্ডি) গুটি থেকেও এ ধরণর সূতা পাওয়া যায়। তাছাড়া চরকার মাধ্যমে এ ধরণের সুতা তৈরীতে আমাদের গ্রামের দরিদ্র মহিলাও অংশ নিয়ে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৬) সূতা তৈরীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত রিলাররা ভাল মানের সূতা তৈরী করবে তাদের-কে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এর ফলে তারা আরও উৎসাহের সাথে তাদের কাজ পরিচালনা করবে।

(৭) উন্নত মানের রেশম সূতা তৈরীর জন্য কম খরচের মধ্যে উন্নত মানের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) রিলাররা যাতে সূতা বিক্রয় করে নায্য দাম পেতে পারে সে জন্য খোলা বাজারে সূতা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) উন্নত মানের সূতা তৈরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করে তা রিলাদের সরবরাহ করা যেতে পারে।

(১০) কাঁচা রেশম বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য পরীক্ষা এবং মানের সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বাংলাদেশে সূতা কাটাই-এর যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI) কে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

(১২) আর্থিক অসচ্ছলতর কারণে দেখা যায় রিলাররা গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের উৎপাদিত সূতা বাজারজাতকরণের সময় ঋণ পরিশোধের জন্য অনেক কমমূল্যে মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে রেশম বোর্ড ও অন্যান্য এনজিও, অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬.৪ রেশম কাপড় বুনন সংক্রান্ত সুপারিশমালাঃ

রেশম শিল্পের চতুর্থ পর্যায় হল- রেশম কাপড় বুনন। অর্থাৎ এই পর্যায়ে রেশম সূতা থেকে রেশম কাপড় তৈরী হয়। আমাদের দেশে সাধারণত হস্তচালিত ও শক্তিচালিত তাঁতের মাধ্যমে রেশম কাপড় বুনন করা হয়। এই সমস্ত তাঁতে শাড়ী, থান, সার্টিং ইত্যাদি কাপড় উৎপাদিত হয়। এই কাপড় বুনন এর কাজ সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যে দুটি সরকারী রেশম কারখানা রয়েছে প্রতি বছর লোকসান দেয়ার ফলে কিছুদিন ধরে এই কারখানা দুটির কাজ বন্ধ রয়েছে। এ দুটি কারখানাতেই একমাত্র তৈরী হ'ত একশত ভাগ খাঁটি রেশম। আর বেসরকারী কারখানাগুলোতে প্রচুর পরিমানে রেশম কাপড় উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত কারখানার বেশীর ভাগ কাপড়ই খাঁটি রেশম নয়। এই সমস্ত কারখানা কৃত্রিম তন্তু মিশিয়ে রেশম কাপড় তৈরী করছে।

রেশম কাপড় তৈরীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে এগুলো সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রদান করা হ'লঃ-

(১) রেশম কাপড় বুননের জন্য রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা দুটি চালু করার জন্য সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) বেসরকারী পর্যায়ে যারা রেশম কাপড় তৈরী করছে তাদের স্থানীয় রেশম সূতার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উন্নতমানের রেশম সূতা আমদানী করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনভাবেই গ্রেডবিহীন সূতা আমদানীর অনুমতি দেয়া যাবে না।

(৪) রেশম বস্ত্র উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) আমদানীকৃত সূতার মান নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এই সূতার নমুনা অবশ্যই বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI)তে পরীক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনভাবেই গ্রেডবিহীন সূতা আমদানীর অনুমতি দেয়া যাবে না

(৬) রেশম বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত তাঁতীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) দেশীয় কাঁচা রেশম ও স্থানীয় রেশম সূতার তৈরী ডুপিয়ন কাপড়ের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কাজেই ডুপিয়ন কাপড়ের উৎপাদন ও মান বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৭) বস্ত্র উৎপাদনের সময় ভোক্তাদের চাহিদানুযায়ী যুগোপযোগী ফ্যাশন এবং ডিজাইন এর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৮) আমাদের তাঁতীদের মূলধনের সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা । কাজেই তাদের অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে অল্প সুদে সহজলভ্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধাণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাহলে সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হবে। আমাদের দেশের তাঁতীরা অধিকাংশই উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু তারা ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত হল তা তারা সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন না।

(১০) রেশম বস্ত্র বয়নে তাঁতীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য বয়ন পূর্ব বস্ত্রপাতি সম্বলিত সহায়ক কেন্দ্র রেশম বস্ত্র উৎপাদন এলাকাগুলোতে স্থাপন করতে হবে।

(১১) বস্ত্র বয়নে যাতে খাঁটি রং এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় সেজন্য রেশম বোর্ডের মাধ্যমে এই সমস্ত দ্রব্য আমদানী করে নায্যমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১১) রেশম সামগ্রী উৎপাদকদের কারিগারী জ্ঞান দানের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে রেশম শিল্পে উন্নত দেশগুলোতেও তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১৩) বাংলাদেশের শক্তি চালিত তাঁত কারখানাগুলোকে আধুনিকায়ন করতে হবে। এ জন্য সরকারীভাবে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) উৎপাদিত বস্ত্রের বাজারজাতকরণ সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১৫) আমদানীকৃত রেশম সূতার তৈরী বস্ত্র রপ্তানির পাশাপাশি দেশী রেশম সূতার তৈরী বস্ত্র রপ্তানির উপরেও জোর দিতে হবে।

৬.৫ উৎপাদিত বস্ত্র বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা ঃ

রেশম কাপড় বাজারজাতকরণ হল সর্বশেষ ধাপ। কারণ প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রেই বাজারজাতকরণ যত ভাল হবে সেই পন্যের বিক্রয় তত বেশী হবে এবং উৎপাদন কার্যক্রম তত অগ্রসর হবে। কাজেই রেশম বস্ত্রের বাজারজাতকরণের দিকেও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ এবং জনগণের ফ্যাশনও দ্রুত পরিবর্তনশীল আর মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে বিভিন্ন দেশের বস্ত্রের আগমন ঘটছে আমাদের মার্কেটে। কাজেই এই পরিবেশে টিকে থাকতে হলে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকেও আরও জোরদার করতে হবে। রেশম পণ্য বাজারজাতকরণের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হলঃ-

(১) রেশম পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির জন্য রেশম শিল্পে উন্নত দেশসমূহের কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশকে সুষ্ঠু এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অন্যান্য দেশের রেশম পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে আমাদের রেশম বস্ত্রের রং, ডিজাইন এবং নকশা ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষজ্ঞ ডিজাইনারের ব্যবস্থা করতে হবে। কাপড়ের প্রিন্ট, নকশা এগুলো কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে করতে হবে।

(৩) কাপড়ের ডায়িং, প্রিন্টিং এবং নকশা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ গ্রহণ, রেশম পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের জন্য রেশম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) আমাদের দেশীয় রেশম সূতার বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলোতে রেশম বস্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৬) পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনঃ ব্যাংক ঋণ, বিমান ভাড়া রেয়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৭) রেশম পণ্য রপ্তানির নিয়ন-কানুনগুলো সহজ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যাতে কম খরচে রপ্তানি করা সম্ভব হয় সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৮) যে সমস্ত দেশে রেশম পণ্য রপ্তানি করা হয় সেখানে অবস্থিত বাংলাদেশের দুতাবাসগুলোকে আমাদের দেশীয় রেশম বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) রেশম জাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের প্রচার মাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার কার্য চালাতে হবে।

(১০) উইভিং, ডায়িং, প্রিন্টিং, নক্শা ইত্যাদি সম্পর্কে সার্ভিস দানের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের সাহায্যে সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১১) রেশম বস্ত্র দিয়ে তৈরীকৃত আইটেম এর পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে এবং এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন - সিল্কের শাড়ী তৈরীর পাশাপাশি রেশম বস্ত্রের জামা, পর্দা, রুমাল, টেবিলক্লথ, কুশন, বালিশের কভার, গাড়ীর সিটের কভার, ওড়না, পোশাক, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈরীর উপরেও জোড় দিতে হবে। এই সমস্ত পণ্যের ডিজাইন, নকশা যাতে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১২) দেশীয় ক্রেতাদের পাশাপাশি বিদেশী ক্রেতারাও যাতে রেশম পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশী রেশম পণ্যের গুণগতমান তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৬.৬ অন্যান্য সুপারিশমালাঃ

উপরোক্ত সুপারিশমালা ছাড়াও রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য আরও কিছু পদক্ষেপ আমাদের নেয়া দরকার। বিশেষ করে রেশম শিল্পের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে সেটাকে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। কারণ এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন

Dhaka University Institutional Repository

কিছু করা সম্ভব হয় না যতক্ষণ না সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পরিকল্পনা বা পদক্ষেপগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রশাসনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ রেশম শিল্পের জন্য এ পর্যন্ত যত ধরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে বাস্তবে তার খুব কম অংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুনেয় যে এ শিল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কতখানি দুর্বল। সুতরাং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়াও রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ সংক্রান্ত কিছু নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে। নিম্নে রেশম শিল্পের অন্যান্য সুপারিশমালাগুলো আলোচনা করা হলঃ-

(১) রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সক্রিয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবাবদিহিমুলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যধারাসমূহ পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকরা যাতে তাদের মতামত বিনিময় করতে পারে এ জন্য অর্ধবার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সূতা প্রস্তুতকারী এবং তাঁতীদের জন্য অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে ক্ষণস্থায়ীভাবে কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পূর্বেই অন্যত্র বদলী করা হয়। বোর্ডের কর্মকর্তাদের এই জাতীয় ঘন ঘন বদলী, পোষ্টিং বন্ধ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগসহ জবাবদিহিমুলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) রেশম শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখা যায় বিচ্ছিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা এক লক্ষ্যে কাজ করে যেতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যে কোন দন্দ্বের সৃষ্টি হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) রেশম শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হলে এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের এ শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। এই জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে আরও জোরদার করতে হবে। এজন্য এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে যে সমস্ত কর্মকর্তা তাদের যেমন প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছে তাদের জন্যও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য BSRTI এর প্রশিক্ষণ শাখাকে আরও উন্নত করতে হবে এবং বিএসএফ ও অন্যান্য এনজিওগুলোকেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।

(৭) রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বি.এস.আর.টি.আই. (BSRTI) এর গবেষণা কার্যক্রমকে আর জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে আরও বিশেষজ্ঞ গবেষক নিয়োগ করতে হবে। উন্নত মানের স্বচ্ছ রেশম উৎপাদন এবং উন্নত রেশম বস্ত্র তৈরীর জন্য তাদেরকে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

(৮) আমাদের দেশীয় রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমদানী ও রপ্তানির উপর শুল্ক ও কর সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে এবং আমাদের দেশীয় রেশম উৎপাদনের অবস্থার দিকে খেয়াল রেখে এই শুল্ক ও কর হ্রাস বৃদ্ধি করতে হবে।

(৯) রেশম শিল্প এমনই একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রত্যেকটি স্তর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি স্তরের কাজে ব্যাঘাত ঘটলে অন্য স্তরেও তার প্রভাব পরে। কাজেই প্রত্যেকটি স্তরেই উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ কাজেই প্রযুক্তি যত উন্নত হবে উৎপাদনও তত বেশী বৃদ্ধি পাবে।

(১০) শুধুমাত্র উপরোক্ত নীতামালা প্রণয়ন করলেই চলবেনা। এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিই রেশম খাতের বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(১১) বেসরকারী খাতেও যাতে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়ন ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

(১২) প্রয়োজনে আমাদের রেশম শিল্পের সাথে জড়িত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রেশম শিল্পে উন্নত দেশ সমূহ যেমনঃ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে গমন করে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তারা এই অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের রেশম শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োগ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) উপরোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে নুতন আইন প্রনয়ন করতে হবে এবং পুরাতন অর্ডিন্যান্স, রুলস, রেগুলেশনের সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) তুঁতজাত রেশমের পাশপাশি অতুঁতজাত রেশম যেমন-তসর, এন্ডি এগুলো চাষের উপরেও জোড় দিতে হবে। যেহেতু অনেক সহজেই আমাদের দেশে এই জাতীয় রেশমের চাষ করা সম্ভব, কাজেই এই জাতীয় রেশম চাষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারী বেসরকারী উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

(১৫) রেশম উন্নয়নের কর্মসূচীতে দেখা যায় অনেক সময় বাজেটে সঠিকভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয় না বা করা হলেও সময় মত তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় না। এর ফলে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয়। সেজন্য রেশম খাতের বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সময়মত তা ছাড়করণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৬) সর্বোপরি রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থ সরবরাহ এবং রেশম শিল্পের কারিগরী প্রক্রিয়া যথাঃ- রেশম পোকার বংশ পরম্পরায় জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও জাত উন্নয়ন, তুঁত চারা উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও সরবরাহ, পলু পালন, রেশমগুটি উৎপাদন, সূতা আহরণ, বস্ত্র বয়ন, ও বিপনন ইত্যাদি বহু ধরণের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ উপসংহারঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের বেশীর ভাগ মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এ দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করতে হলে শিল্পোন্নয়ন একটি অন্যতম উপায়। এদেশের দারিদ্রপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রেশম শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশের এই সম্ভবনাময় শিল্পটি আজ ধ্বংসের মুখে। কাজেই যেভাবেই হোক আমাদের এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার, জনগণ এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

বিদেশী রেশমবস্ত্র আমদানীর সাথে সাথে আমাদের দেশীয় রেশমবস্ত্র যাতে টিকে থাকে এবং আমাদের দেশীয় রেশম শিল্প যাতে ধ্বংসের সম্মুখীন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের জনগণ যাতে দেশীয় রেশমবস্ত্র ক্রয়ে আগ্রহী হয় সেই ধরনের মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য প্রচুর প্রচারণা চালাতে হবে।

রেশম শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে এর প্রতিটি স্তরে কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানগুলোও বের করতে হবে। শুধু সমাধানগুলো বের করলেই চলবে না সেগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি সেই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারকীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই কাজগুলো করার জন্য আমাদের দেশের সরকার এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই আমরা এ শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে পূনরুদ্ধার করতে পারব।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১
প্রশ্নমালা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

প্রশ্নমালা -১

তুঁত চাষীদের মতামত

উত্তর দাতার নামঃ ----------

বয়স ঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

১। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

উত্তরঃ (ক) ০ - ৫ম শ্রেণী

(খ) ষষ্ঠ শ্রেণী - এস.এস.সি.

২। তুঁত গাছ চাষ কি আপনার মূল পেশা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।

৩। তুঁত চাষের কাজ কাদের দ্বারা করানো হয় ?

উত্তরঃ (ক) পরিবারের সদস্যদের দ্বারা।

(খ) পরিবার বহির্ভূত শ্রমিকের দ্বারা।

৪। জমির মালিকানার ধরণ কি ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব (খ) বর্গাচাষ।

৫। তুঁত গাছের চাষ সম্পর্কিত কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।

Dhaka University Institutional Repository

৬। মূলধন প্রাপ্তির উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব তহবিল

(খ) নিজস্ব তহবিল ও রেশম বোর্ড

(গ) নিজস্ব তহিবল ও এনজিও

(ঘ) নিজস্ব তহবিল ও দেশীয় মহাজন।

৭। কোন পদ্ধতিতে তুঁত চাষ করেন?

উত্তরঃ (ক) ঝুপি পদ্ধতি

(খ) ঝাড় পদ্ধতি

(গ) গাছ পদ্ধতি

৮। তুঁত গাছ চাষে কোন জাতের চারা ব্যবহার করেন ?

উত্তরঃ (ক) দেশী জাত

(খ) উন্নত জাত।

৯। পানি সেচ ব্যবস্থা আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না

১০। জমিতে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করা হয় কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।

১১। তুঁত গাছের ক্ষতিকারক রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমনে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।

১২। বিঘা প্রতি তুঁত পাতা উৎপাদনের পরিমান কত ?

উত্তরঃ (ক) ৫০ মণের নীচে।

(খ) ৫০ -১০০ মণ।

১৩। উৎপাদিত তুঁত পাতা কিভাবে ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ (ক) নিজে পলুপালনের জন্য ব্যবহার করেন।

(খ) পলুপালনকারীদের কাছে বিক্রয় করেন।

১৪। তুঁত পাতার চাহিদা বাড়ছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না।

১৫। তুঁত পাতার চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ কি ?

উত্তরঃ (ক) পলু পালনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে

(খ) বিদেশী সূতা আমদানীর প্রভাব।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
প্রশ্নমালা ঃ ২
পলুপালনকারী বা বসনীদের মতামত

উত্তর দাতার নামঃ ----------

বয়স ঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

১। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

উত্তরঃ (ক) ০ - পঞ্চম শ্রেণী (খ) ৬ষ্ঠ শ্রেণী - এস.এস.সি.

২। পলু পালন কি আপনার মূল পেশা না সহকারী পেশা ?

উত্তরঃ (ক) মূল পেশা (খ) সহকারী পেশা

৩। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পলু পালন কাজে সহযোগিতা করে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না

৪। মোট কতটি বন্দে পলু পালন করেন ?

উত্তরঃ (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৫। কোন জাতের পলু পালন করেন ?

উত্তরঃ একচক্রী (২) দ্বিচক্রী (গ) বহুচক্রী (ঘ) শংকর

৬। আদর্শ পলু ঘর আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না

৭। তুঁত পাতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না

৮। পলু পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা ?

উত্তরঃ (ক) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়।

৯। পলুপালনের জন্য উন্নতমানের সরঞ্জামাদি আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) আছে (খ) নাই

Dhaka University Institutional Repository

১০। পলুঘর ও সরঞ্জামাদি ফরমালিন ও ব্লিচিং দ্রবণে বিশোধন করা হয় কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ) না

১১। রোগাক্রান্ত হয়ে শতকরা কত পলুর মৃত্যু হয় ?

উত্তরঃ (ক) ২৫ % এর নীচে (খ) ২৫% (গ) ২৫% এর উপরে।

১২। মূলধন প্রাপ্তির উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব তহবিল

(খ) নিজস্ব তহবিল ও ঋণকৃত।

১৩। উৎপাদিত রেশমগুটি কিভাবে ব্যবহার করেন ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব সূতা তৈরীর কাজে ব্যবহার করেন।

(খ) রেশম বোর্ডের কাছে বিক্রয় করেন।

(গ) সাধারণ সূতা উৎপাদনকারীদের কাছে বিক্রয় করেন।

(ঘ) দালাল বা ফরিয়াদের কাছে বিক্রয় করেন

(ঙ) এনজিওদের কাছে বিক্রয় করেন।

১৪। পলু পালনের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ কি ?

উত্তরঃ (ক) মূলধনের অভাব

(খ) বিদেশী সূতার আমদানী

(গ) রেশম গুটির দামের অভাব

(ঘ) ডিমের অভাব

(ঙ) তুঁত পাতার অপর্যাপ্ততা।

১৫। পলু চাষের উন্নতি সম্পর্কে আপনার (বসনী) মতামত কি ?

উত্তরঃ (ক) রেশমগুটির চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে।

(খ) বিদেশী সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ করতে হবে।

(গ) মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) রেশমগুটির ন্যায্য মূল্য প্রদান করতে হবে।

(ঙ) রেশম DFL-এর দাম কমাতে হবে।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
প্রশ্নমালাঃ ৩
সূতা প্রস্তুতকারীদের মতামত

উত্তর দাতার নামঃ ----------

বয়স ঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

১। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

উত্তরঃ (ক) ০ - ৫ম শ্রেণী

(খ) ৬ষ্ঠ - এস.এস.সি.

২। সূতা প্রস্তুত করা আপনার কোন ধরণের পেশা ?

উত্তরঃ (ক) মূল পেশা

(খ) সহকারী পেশা।

৩। সূতা তৈরী সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না ?

উত্তরঃ (ক) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

(খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়।

৪। সূতা তৈরীতে কি ধরণের রেশমগুটি ব্যবহার করা হয় ?

উত্তরঃ (ক) উন্নতমান

(খ) নিম্নমান।

Dhaka University Institutional Repository

৫। কোন পদ্ধতিতে রেশমগুটি রিলিং ও স্পিনিং করা হয় ?

উত্তরঃ (ক) চরকা

(খ) কাঠঘাই

(গ) উন্নত মেশিন

৬। আপনার মূলধন সংগ্রহের উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব তহবিল

(খ) নিজস্ব তহবিল ও ঋণকৃত

৭। উৎপাদিত সূতা কার কাছে বিক্রয় করেন ?

উত্তরঃ (ক) রেশম বোর্ড ও এন.জি.ও.

(খ) মধ্যবর্তী সূতার ব্যবসায়ী।

৮। রেশম সূতা উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তরঃ (ক) মূলধনের অভাব

(খ) রেশমগুটির অভাব

(গ) চাহিদার স্বল্পতা।

(ঘ) বিদেশী সূতার আমদানী।

৯। সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তরঃ (ক) সূতার নায্য মূল্য প্রদান।

(খ) বিদেশী সূতার আমদানী হ্রাস।

(গ) সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর ঃ

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

প্রশ্নমালাঃ ৪

বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের মতামত

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ----------

উত্তর দাতার নামঃ ----------

বয়স ঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

১। প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কি ধরণের ?

উত্তরঃ (ক) একমালিকানা

(খ) অংশীদারী।

(গ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী।

২। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তরঃ (ক) ০ - ২১ জন

(খ) ২১ - ৪০ জন

(গ) ৪১- ৬০ জন

(ঘ) ৬১ - ৮০ জন

(ঙ) ৮১ - ১০০ জন

৩। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা ?

উত্তরঃ (ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

(খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়।

৪। প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) নিজস্ব তহবিল

(খ) নিজস্ব তহবিল ও ঋণকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

৫। বস্ত্র তৈরীতে কি ধরণের তাঁত ব্যবহৃত হয় ?

উত্তরঃ (ক) হস্ত চালিত তাঁত

(খ) বিদ্যুৎচালিত তাঁত

(গ) হস্ত ও বিদ্যুৎ চালিত উভয় তাঁত

৬। বস্ত্র উৎপাদনে কি ধরণের সূতা (দেশী ও বিদেশী) ব্যবহৃত হয় ?

উত্তরঃ (ক) দেশী সূতা

(খ) বিদেশী সূতা

(গ) দেশী ও বিদেশী উভয় সূতা

৭। বস্ত্র উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করেন কে ?

উত্তরঃ (ক) কারিগর নিজে

(খ) মান নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা

৮। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কারখানার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে কিনা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ

(খ) না

৯। ভোক্তাদের নিকট পন্য বন্টন করেন কিভাবে ?

উত্তরঃ (ক) নিজে ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে

(খ) শুধুমাত্র মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে

১০। বস্ত্রের ডিজাইনার আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ

(খ) না

১১। ভোক্তাদের পন্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করেন কিভাবে ?

উত্তরঃ (ক) বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে

(খ) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে

(গ) মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে

(ঘ) উল্লেখিত সব পদ্ধতিতে

১২। বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করেন কিভাবে ?

উত্তরঃ (ক) উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী

(খ) প্রতিযোগিতার সাথে খাপ খাইয়ে

(গ) ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী

১৩। পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ

(খ) না

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারনের ব্যবস্থা আছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ

(খ) না

১৫। ভোক্তার কোন বস্ত্রের প্রতি চাহিদা বেশী ?

উত্তরঃ (ক) দেশী বস্ত্র

(খ) বিদেশী বস্ত্র

(গ) দেশী ও বিদেশী উভয় বস্ত্র

১৬। দেশী রেশম বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তরঃ (ক) মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা

(খ) বস্ত্রের নায্য মূল্য প্রদান

(গ) কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(ঘ) বস্ত্রের ডিজাইন উন্নয়ন

(ঙ) বিদেশী বস্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ

(চ) সরকারী সহযোগিতা বৃদ্ধি

উত্তর দাতার স্বাক্ষর

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

প্রশ্নমালাঃ ৫
খুচরা ব্যবসায়ীদের মতামত

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ----------

উত্তর দাতার নামঃ ----------

বয়স ঃ ----------পদবী ঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

১। বস্ত্র সংগ্রহরে উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) উৎপাদনকারী
(খ) পাইকার
(গ) নিজস্ব কারখানা

২। বর্তমানে সরবরাহকৃত বস্ত্রের ডিজাইনের মান উন্নত কিনা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অপরিবর্তীত

৩। উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পন্যের মান পূর্বের চেয়ে বর্তমানে কেমন ?

উত্তরঃ (ক) ভাল
(খ) মন্দ
(গ) অপরিবর্তীত

৪। পূর্বের চেয়ে বর্তমানে পন্যের ক্রয় মূল্য কেমন ?

উত্তরঃ (ক) বেশী
(খ) কম
(গ) অপরিবর্তীত

৫। সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বাড়ছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ
(খ) না

Dhaka University Institutional Repository

৬। রেশম বস্ত্রের বিক্রয়মূল্য বাড়ছে না কমছে ?

উত্তরঃ (ক) বাড়ছে

(খ) কমছে

(গ) অপরিবর্তীত

৭। বিদেশী কাপড় আমাদের দেশীয় বস্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে কি না ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ

(খ) না

৮। কি পদ্ধতিতে প্রসার কার্যক্রম চালান হয় ?

উত্তরঃ (ক) বিজ্ঞাপন

(খ) ব্যক্তিগত যোগাযোগ (আদর্শ বিক্রয়কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে)

৯। মূলধন সরবরাহের উৎস কি ?

উত্তরঃ (ক) শুধুমাত্র নিজস্ব তহবিল

(খ) নিজস্ব তহবিল ও ঋণকৃত তহবিল।

(গ)শুধুমাত্র ঋণকৃত তহবিল।

১০। বাংলাদেশী সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তরঃ (ক) মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা।

(খ) বস্ত্রের নায্যমূল্য প্রদান ।

(গ) ডিজাইনে পরিবর্তন সাধন।

(ঘ) বস্ত্রের মান উন্নয়ন।

(ঙ) সিল্ক বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধকরণ।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর ঃ

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের সারণী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের সারণী

১. তুঁত চাষীদের তথ্যের সারণী

সারণী-১ (১)

তুঁত চাষীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
০ - ৫ম শ্রেণী	১৪	৭০%
৬ষ্ঠ শ্রেণী - এস.এস.সি	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

তুঁত গাছ চাষ মূল পেশা কি না

সারণী -১ (২)

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	৫০%
না	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (৩)

তুঁত চাষের কাজ কাদের দ্বারা করা হয়

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারের সদস্যদের দ্বারা	১০	৫০%
পরিবারের সদস্য ও পরিবার বহির্ভূত শ্রমিকের দ্বারা	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১ (৪)

জমির মালিকানার ধরণ কি

মালিকানার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব	১৪	৭০%
বর্গাচাষ	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (৫)

তুঁত গাছের চাষ সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যা	৬	৩০%
না	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (৬)

মূলধন প্রাপ্তির উৎস

উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব তহবিল	৪	২০%
নিজস্ব তহবিল ও রেশম বোর্ড	৪	২০%
নিজস্ব তহবিল ও এনজিও	৪	২০%
নিজস্ব তহবিল ও দেশীয় মহাজন	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১ (৭)

তুঁত চাষ পদ্ধতির ধরণ

তুঁত চাষ পদ্ধতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ঝুপি পদ্ধতি	১৬	৮০%
ঝাড় পদ্ধতি	-	-
গাছ পদ্ধতি	৪	২০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (৮)

কোন জাতের তুঁত চারা ব্যবহার করে।

তুঁত চারার জাত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
দেশী জাত	৬	৩০%
উন্নত জাত	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (৯)

পানি সেচ ব্যবস্থা আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬	৩০%
না	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১ (১০)

জমিতে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করা হয় কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	৫০%
না	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (১১)

তুঁত গাছের ক্ষতিকারক রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমনে ঔষধ প্রয়োগ হয় কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	৫০%
না	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (১২)

বিঘা প্রতি তুঁত পাতা উৎপাদনের পরিমান কত

উৎপাদনের পরিমান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫০ মনের নীচে	১০	৫০%
৫০ -১০০ মণ	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (১৩)

উৎপাদিত তুঁত পাতা কিভাবে ব্যবহার করেন

তুঁত পাতার ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজে পলু পালনের জন্য ব্যবহার করেন	১৬	৮০%
পলুপালনকারীদের কাছে বিক্রয় করেন	৪	২০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -১ (১৪)

তুঁত পাতার চাহিদা বাড়ছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	-	-
না	২০	১০০%
মোট	২০	১০০

সারণী -১ (১৫)

তুঁত পাতার চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পলু পালনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে	১৫	৭৫%
বিদেশী সূতা আমদানীর প্রভাব	৫	২৫%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

২. পলুপালনকারীদের তথ্যের সারণী

সারণী -২ (১)

পলুপালনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ - ৫ম শ্রেণী	১৪	৭০%
৬ষ্ঠ - এস.এস.সি.	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (২)

পলু পালন মূল পেশা না সহকারী পেশা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূল পেশা	১২	৬০%
সহকারী পেশা	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (৩)

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পলু পালন কাজে সহযোগিতা করে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২০	১০০%
না	-	-
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২ (৪)

মোট কতটি বন্দে পলু পালন করেন

পলু পালনের বন্দের সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১টি	০	০
২টি	০	০
৩টি	০	০
৪টি	২০	১০০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (৫)

কোন জাতের পলু পালন করেন

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
একচক্রী	২	১০%
দ্বিচক্রী	৪	২০%
বহুচক্রী	৮	৪০%
শংকর	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (৬)

আদর্শ পলুঘর আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আছে	৮	৪০%
নাই	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২ (৭)

তুঁত পাতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	০০	০০
না	২০	১০০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (৮)

পলু পালনকারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	৮	৪০%
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (৯)

পলু পালনে উন্নত মানের সরঞ্জামাদি আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আছে	৮	৪০%
নাই	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (১০)

পলুঘর ও সরঞ্জামাদি ফরমালিন ও ব্লিচিং দ্রবণে বিশোধন করা হয় কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬	৩০%
না	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২ (১১)

রোগাক্রান্ত হয়ে শতকরা কত পলুর মৃত্যু হয়

পলুর মৃত্যুর হার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
২৫% এর নীচে	২	১০%
২৫%	১৬	৮০%
২৫% এর উপরে	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (১২)

মূলধন প্রাপ্তির উৎস কি

মূলধনের উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব তহবিল	১০	৫০%
নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিল	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (১৩)

উৎপাদিত রেশমগুটি কিভাবে ব্যবহার করেন

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব সূতা তৈরীর কাজে	৬	৩০%
রেশম বোর্ডের কাছে বিক্রয়	৬	৩০%
সাধারণ সূতা উৎপাদনকারীর কাছে বিক্রয় -	২	১০%
দালাল বা ফরিয়াদের কাছে বিক্রয়	৪	২০%
এনজিওদের কাছে বিক্রয়	২	১০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২ (১৪)

পলু পালনের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূলধনের অভাব	৬	৩০%
বিদেশী সূতার আমদানী	৪	২০%
রেশমগুটির দামের অভাব	৬	৩০%
DFL এর অভাব	২	১০ %
তুঁত পাতার অপর্যাপ্ততা	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী -২ (১৫)

পলু চাষের উন্নতি সম্পর্কে পলু পালনকারীদের (বসনী) মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রেশম গুটির চাহিদা বৃদ্ধি	৬	৩০%
বিদেশী সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ	৪	২০%
মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা	৪	২০%
রেশমগুটির নায্য মূল্য প্রদান	৪	২০%
রেশম DFL -এর দাম কমাতে হবে	২	১০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৩. সূতা উৎপাদনকারীদের তথ্যের সারণী

সারণী -৩ (১)

সূতা উৎপাদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ - ৫ম শ্রেণী	১২	৬০%
৬ষ্ঠ - এস.এস.সি.	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী -৩ (২)

সূতা প্রস্তুত করা কি ধরণের পেশা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূল পেশা	১২	৬০%
সহকারী পেশা	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী -৩ (৩)

সূতা প্রস্তুত সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ আছে কি না?

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	৬	৩০%
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৩ (৪)

সূতা তৈরীতে ব্যবহৃত রেশম গুটির মান

রেশম গুটির মান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
উন্নতমান	৮	৪০%
নিম্ন মান	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৩ (৫)

সূতা রিলিং ও স্পিনিং পদ্ধতি

রিলিং ও স্পিনিং পদ্ধতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
চরকা	৪	২০%
কাঠঘাই	১৪	৭০%
উন্নত মেশিন	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৩ (৬)

মূলধনের উৎস

মূলধনের উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব তহবিল	৮	৪০%
নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিল	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৩ (৭)

উৎপাদিত সূতার ক্রেতা

উৎপাদিত সূতার ক্রেতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রেশম বোর্ড ও এনজিও	৬	৩০%
মধ্যবর্তী সূতার ব্যবসায়ী	১৪	৭০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩ (৮)

রেশম সূতার উৎপাদন হ্রাসজনিত কারণ সম্পর্কে মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূলধনের অভাব	৪	২০%
রেশম গুটির অভাব	২	১০%
চাহিদার স্বল্পতা	৬	৩০%
বিদেশী সূতার আমদানী	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৩ (৯)

সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরামর্শ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সূতার নায্য মূল্য প্রদান	৬	৩০%
বিদেশী সূতার আমদানী হ্রাস	৮	৪০%
সূতা আমদানীর উপর কর আরোপ	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৪. বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের তথ্যের সারণী

সারণী-৪ (১)

প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরণ

প্রতিষ্ঠানের মালিকানা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
একক মালিকানা	১২	৬০%
অংশীদারী	২	১০%
প্রাঃ লিঃ কোম্পানী	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (২)

উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা

শ্রমিকের সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ - ২০ জন	৮	৪০%
২১ - ৪০ জন	৪	২০%
৪১-৬০ জন	২	১০%
৬১ -৮০ জন	৪	২০%
৮১ - ১০০ জন	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (৩)

শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কি না

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ততা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষন প্রাপ্ত	৮	৪০%
প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নয়	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪ (৪)

মূলধন সরবরাহের উৎস কি

মূলধনের উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব তহবিল	৮	৪০%
নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিল	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (৫)

বস্ত্র উৎপাদনে তাঁত ব্যবহারের ধরণ

তাঁতের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হস্ত চালিত তাঁত	৮	৪০%
বিদ্যুৎ চালিত তাঁত	৬	৩০%
হস্ত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁত	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (৬)

রেশম বস্ত্র উৎপাদনে দেশী ও বিদেশী সূতার ব্যবহার

ব্যবহৃত সূতার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
দেশী সূতা	২	১০%
বিদেশী সূতা	১২	৬০%
উভয় দেশী ও বিদেশী সূতা	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪ (৭)

বস্ত্র উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করেন কে ?

মান নিয়ন্ত্রণকারী	গণসংখ্যা	শতকরা হার
কারিগর নিজে	১৬	৮০%
মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে	৪	২০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (৮)

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কারখানার কাজে বাধা সৃষ্টি করে কিনা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৮	৯০%
না	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (৯)

ভোক্তাদের নিকট পন্য বন্টন করেন কিভাবে

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজে ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে	১০	৫০%
শুধুমাত্র মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (১০)

বস্ত্রের ডিজাইনার আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	৫০%
না	১০	৫০%
মোট	২০	১০০ %

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪ (১১)

ভোক্তাদের পন্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিজ্ঞাপন	-	-
ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১২	৬০%
মেলায় অংশ গ্রহণ	-	-
উল্লেখিত সব পদ্ধতিতে	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (১২)

মূল্য নির্ধারণ করেন কিভাবে

মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
উৎপাদনব্যয় অনুযায়ী	১৬	৮০%
প্রতিযোগিতার সাথে খাপ খাইয়ে	২	১০%
ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতানুযায়ী	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (১৩)

পন্য রপ্তানির ব্যবস্থা আছে কিনা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪	২০%
না	১৬	৮০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪ (১৪)

ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ব্যবস্থা আছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮	৪০%
না	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (১৫)

ভোক্তার কোন বস্ত্রের প্রতি চাহিদা বেশী

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
দেশী বস্ত্র	৬	৩০%
বিদেশী বস্ত্র	১২	৬০%
দেশী ও বিদেশী উভয় বস্ত্র	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৪ (১৬)

দেশী রেশম বস্ত্রের চাহিদা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরামর্শ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূলধন সরবরাহ	২	১০%
বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য প্রদান	২	১০%
কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৪	২০%
বস্ত্রের ডিজাইন উন্নয়ন	৪	২০%
বিদেশী বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধ	৪	২০%
সরকারী সহযোগিতা বৃদ্ধি	৪	২০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৫. খুচরা ব্যবসায়ীদের তথ্য সারণী

সারণী-৫ (১)

বস্ত্র সংগ্রহের উৎস কি

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
উৎপাদনকারী	৮	৪০%
পাইকার	৪	২০%
নিজস্ব কারখানা	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (২)

বর্তমানে সরবরাহকৃত বস্ত্রের ডিজাইনের মান উন্নত কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২	৬০%
না	৬	৩০%
অপরিবর্তীত	২	১০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (৩)

উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের মান পূর্বের চেয়ে বর্তমানে কেমন

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল	৮	৪০%
মন্দ	--	--
অপরিবর্তীত	১২	৬০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫ (৪)

পূর্বের চেয়ে বর্তমানে পন্যের ক্রয়মূল্য কেমন

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বেশী	৬	৩০%
কম	৪	২০%
অপরিবর্তীত	১০	৫০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (৫)

সিল্ক বস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে কি না

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৪	৭০%
না	৬	৩০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (৬)

রেশম বস্ত্রের বিক্রয়মূল্য বাড়ছে না কমছে

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বাড়ছে	৮	৪০%
কমছে	৪	২০%
অপরিবর্তীত	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫ (৭)

বিদেশী কাপড় আমাদের দেশীয় বস্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে কিনা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২	৬০%
না	৮	৪০%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (৮)

কি পদ্ধতিতে প্রসার কার্যক্রম চালনো হয়

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিজ্ঞাপণ	১৫	৭৫%
ব্যক্তিগত যোগাযোগ (আদর্শ বিক্রয়কর্মী)	৫	২৫%
মোট	২০	১০০

সারণী-৫ (৯)

মূলধনের উৎস

মূলধনের উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা হার
শুধুমাত্র নিজস্ব তহবিল	৮	৪০%
নিজস্ব ও ঋণকৃত তহবিল	১০	৫০%
শুধুমাত্র ঋণকৃত তহবিল	২	১০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫ (১০)

খুচরা ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশী সিল্ক কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরামর্শ

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মূলধন সরবরাহ	৪	২০%
বস্ত্রের নায্যমূল্য	৪	২০%
ডিজাইন পরিবর্তন	৪	২০%
বস্ত্রের মান উন্নয়ন	৪	২০%
সিল্ক বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধকরণ	৪	২০%
মোট	২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩
আলোকচিত্র ও মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং ১

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এ ধারণকৃত ঝুল্লি তুঁত গাছের ছবি।

ছবি নং ২

ভোলাহাট রেশম বীজাগারে ধারণকৃত ঝাড় তুঁত গাছের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং ৩

ভোলাহাট রেশম বীজাগারে ধারণকৃত গাছ তুঁতের ছবি।

ছবি নং ৪

ভোলাহাটে ধারণকৃত রেশম গুটিসহ চন্দ্রকীর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং ৫

কোণার ঘাট, ভোলাহাটে ধারণকৃত চরকার ছবি।

ছবি নং ৬

কোণার ঘাট, ভোলাহাটে ধারণকৃত কাটঘাই এর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং ৭

ভোলাহাট মিনিকিলেচারের ছবি।

ছবি নং ৮

তাঁতী পাড়া, লাহাড়পুর, চাপাইনবাবগঞ্জে ধারণকৃত বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে ববিনে সূতা জড়ানোর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং ৯

বিশ্বনাথপুর, ক্যানসাট, শিবগঞ্জে ধারণকৃত দেশীয় পদ্ধতিতে তাঁতে কাপড় বুননের ছবি।

ছবি নং ১০

বিশ্বনাথপুর, ক্যানসাট, শিবগঞ্জে ধারণকৃত তাঁতে কর্মরত মহিলার ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং- ১১

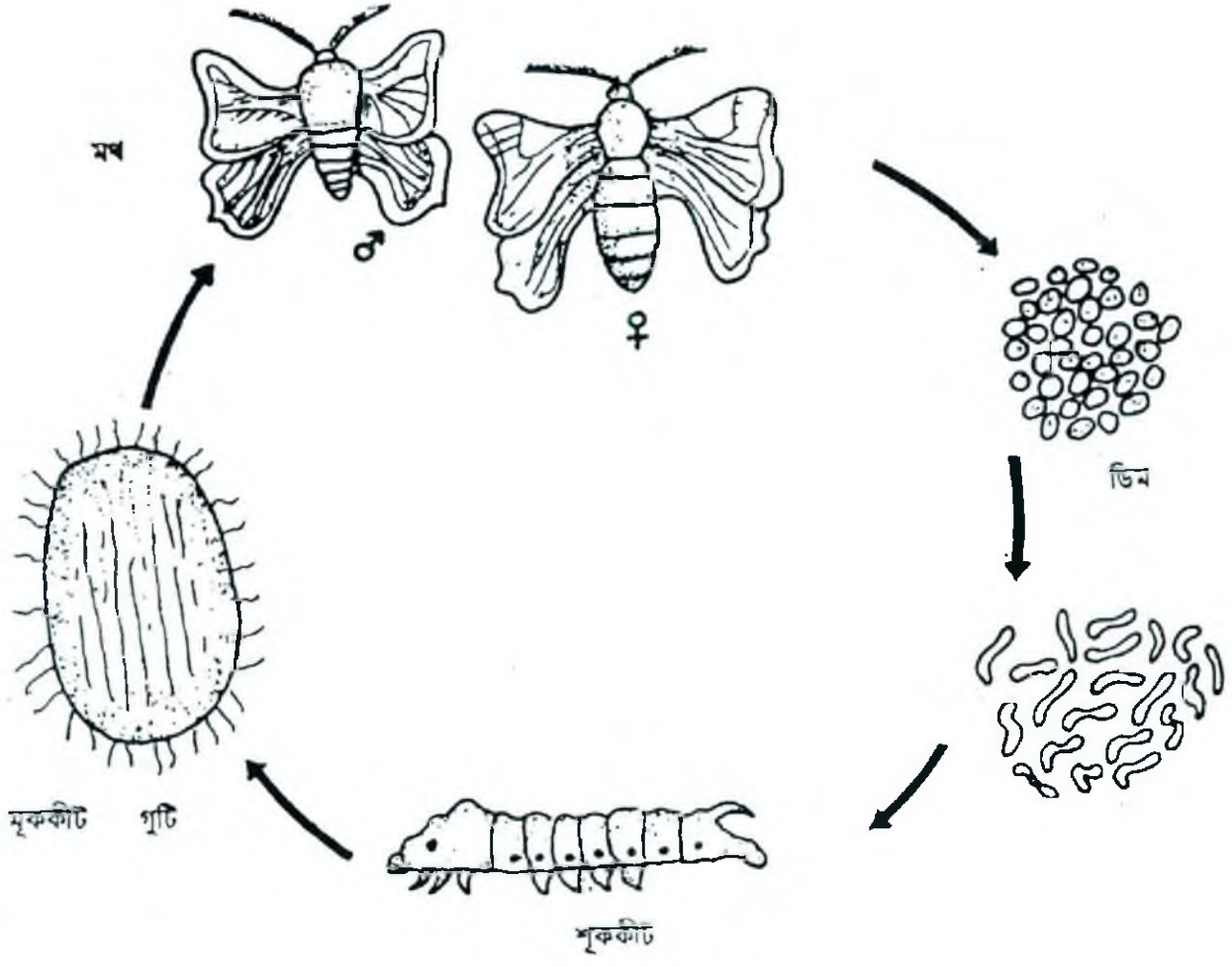

রেশম পোকার জীবনচক্র

Dhaka University Institutional Repository

ছবি নং- ১২

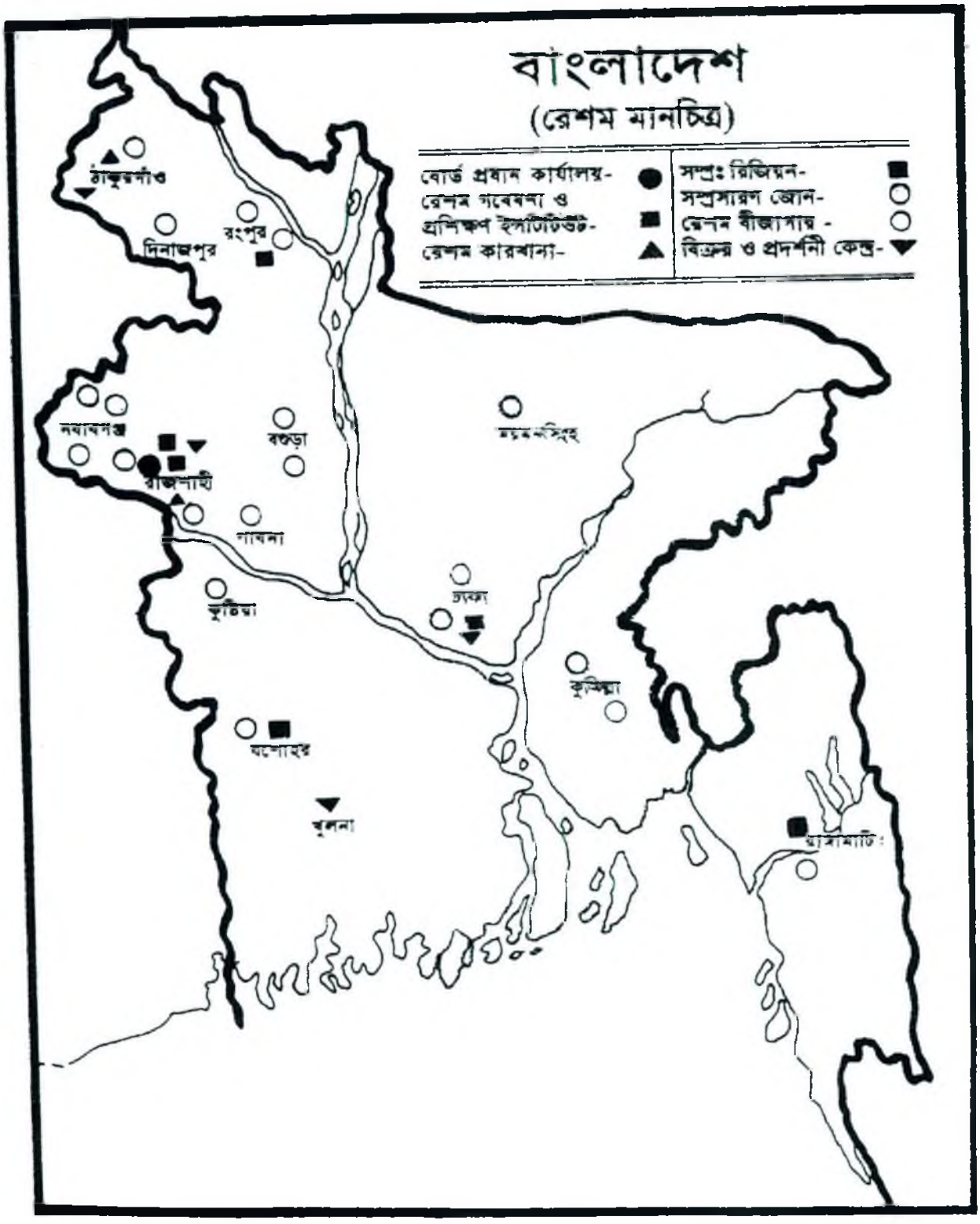

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী
(BIBLIOGRAPHY)

১. আবেদীন , বাকী, আখতার : ২০০০; " উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি" কাজী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।

২. A.K.M. Mustafizur Rahman :
1989 June; " Marketing Problem of small Scale Industries in Bangladesh : A study of silk products in Rajshahi District", BMET Project, Rajshahi University.

৩. আনিসুর রহমান ঃ চতুর্বিংশ সংস্করণ -২০০১; "বাংলাদেশের অর্থনীতি" প্রগতি পাবলিশার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪. A. Salam : 1983; "Whether Ericulture Can Help some sort of Food and Fibre Problems in Bangladesh," Resham, Bangladesh.

৫. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঃ ২০০৩; বাংলা পিডিয়া।

৬. BIBM : November 1984, Bangladesh, Institute of Bank Management, Supply study on silk and silk Products"

৭. BIDS : 1981; Bangladesh Institute of Develomemt studies, Pratima, P. Mazumder and Salimullah " Sericulture Industry in Bangaldesh".

* 1986; Institute of Bangaldesh Studies, "Supply Side study on Sericulture in Bangladesh"

* 1988; Institute of Bangladesh Studies, Zaid Bakht and others, " Sericulture Industry In Bangladesh : Analysis of Production Performane, Constraints and Growth Potentials.

৮. বি.এস.বি. ঃ ১৯৯২ (ক); বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, "আর্থিক উন্নয়নে রেশম শিল্প"।

* ১৯৯২ (খ) বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, " বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র"

* ১৯৯৩; বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; " স্মরণিকা জাতীয় রেশম সম্মেলন - ৯৩"।

* ১৯৯৪; বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, " তথ্য ও পরিসংখ্যান"- ৯৪

* ১৯৮৯; বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, "বাংলাদেশের রেশম শিল্প, কারখানা সমূহের সমস্যাবলী ও সমাধান (আলোচনা ও সুপারিশমালা)"।

Dhaka University Institutional Repository

৯. BSB : 1986; Bangladesh Sericulture Board, "Intergrated Scheme on Development of Sericulture and Silk Industry"

১০. BMDC : 1984; Bangladesh Management Development Centre " Evaluation of Bangladesh Sericulture Board" April.

১১. বি.এস.এফ. : ২০০৩; বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, " বাংলাদেশের রেশম নীতিমালা - ২০০৩

* ২০০৫; বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন " চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট অঞ্চলের রেশম চাষ পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা একটি সমীক্ষা" ।

১২. CATMSS / IGWEP : 2001; National Workshop Concept Paper Doc. Rajshahi.

১৩. EPSIC : 1970; East pakistan Small Industries Corporation, "Development of Sericulture"

১৪. FAO : 1976; Food and Agriculture Organisation of the United Nations, "Sericulture Mannual - 3" Silk Reeling.

* 1979; Food and Agriculture Organisation of the United Nations " Non Mulberry Silk"

১৫. GOB : 1982; Government of Bangladesh " Report of the Task Force for Development of Silk Industry."

১৬. এইচ ম্যাক্সওয়েল ও অ্যানসোয়াজ ঃ ১৯১২; বাংলাদেশ শিল্পের ঐতিহাসিক দিক ঃ রেশম শিল্পের উপর একটি প্রতিবেদন।

১৭. IBS, RU : 1983; Institute of Bangladesh studies, Rajshahi University," " The District of Rajshahi its Past and Present. "

১৮. কাজী মোহাম্মদ মিছের ঃ ১৯৬৫; " রাজশাহীর ইতিহাস" বগুড়া কাজী প্রকাশনী , বগুড়া।

১৯. কৃষ্ণস্বামী ও অন্যান্য ঃ ১৯৭৩; " বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী ব্যুলেটিন" " সেরিকালচার ম্যানুয়াল - ২, পলু পালন।"

২০. L.S.S. Omelly : 1916; "Rajshahi Gazetteer"

২১. মোঃ আব্দুর রশীদ খান ঃ ১৯৯৮, " বাংলাদেশের ঐতিহ্য ঃ রাজশাহী সিল্ক "উত্তরা সাহিত্য মজলিস, মনিবাজার, রাজশাহী"।

২২. মোঃ আলতাফ হোসেন, ডঃ মোঃ আলাউদ্দিন, ১৯৯৮, " কারবার সংগঠন"।

২৩. খালেকুজ্জামান ঃ ২০০১; " ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা" দি যমুনা পাবলিশার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. M.A. Rahman : 1983; "Some Aspects of Sericulture in The District of Rajshahi - Its Past and Present" IBS, Rajshahi.

২৫. M.A. Hamid and others : 1989; " Silk Sector in Bangladesh" : A Selective Review " Bangladesh Sericulture Board.

২৬. Dr. M. Alimullah Mian : 1989; A case Study on Rajshahi Silk Factory" IBA, Dhaka University.

২৭. Md. Zakir Hossain : 1988; " Financial Problems of Rajshahi Silk Factory " Department of Finance and Banking R.U.

২৮. Md. Jahangir Ali : 1989; " Production of Silk Goods : A case study of Shah Makhadum Silk Factory, Rajshahi" BMET Project, University Grant Commission, Dhaka.

২৯. MIDAS : 1985; Micro Industries Development Assistance Society, " Silk Market Study" March.

৩০. MOP : 1980; Ministry of Planning Government of Bangladesh, " Report on Sericulture Subsector"

৩১. নাজনির নূর বেগমঃ ১৯৯৭; " সামাজিক গবেষণা পরিচিতি" জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশনা, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা।

৩২. N.G. Mukarjee : 1975; A monograph on the Sericulture Fabrics in Bengal : In Arts and Industry Through Ages, Navarang.

৩৩. P. Kuenzi, K.Sengupta and L.V. Saptarshi : 1977; Feasibility Study for Bangladesh - Swiss Development Project in Sericulture"

৩৪. Dr. Priya Brata Paul : 1989; " Activity level of Reeling Section in Rajshahi and Thakurgaon Silk Factories " BMET Project, Rajshahi, University.

৩৫. R.U. : 1986; Rajshahi University, Department of Economics, " Socio Economic Viability of Sericulture Industry in Bangladesh."

৩৬. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৮৫; দীপকেন্দ্র নাথ দাস, "বাংলাদেশের রেশম পন্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সমস্যা।

৩৭. Shelly Feldman : 1978; " Prospects of Silk Production in Bangladesh."

৩৮. W.W. Hunter : 1873; " A statistical Account of Bengali." Volume - 8.

৩৯. Wazifa Ahmed : 1989 The Silk Industry in the District of Rajshahi in the Nineteenth Century, The Journal of IBS, R.U, Vol. XII, Annual.